প্রথম বারিধার, বেদনা-উপহার
লহ গো,
শেষের বিষ আজ করিল নব-সাজ
বহ' গো।
স্থনীল কণ্ঠের সাগর মন্থের
বেদনা,
হরষে তুলি' লও; আপন শিরে বও
সাধনা॥

আজিকে মেদিনীর দীনতা-নত-শির
নমিছে।
ক্ষণের তৃণদল ভুঞ্জি' ধারাজল
ভ্রমিছে।
তিমির দিগভরি' জাগিছে শর্ব্বরী
গোপনে,
ঝিল্লী আজিকার স্বনিছে ব্যথাভার
পবনে।
বিধুর বেদনায় পরাণ আজি হায়
বাঁধা রে।
প্রথম বারিধারা আজিকে হ'ব হারা
আঁধারে॥

শিল্পের আদর্শ

শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী

প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী মহাশয়ের সাক্ষাৎকালে শিল্প ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার অনুলিখিত বিবরণ।

কিছু দিন আগে কার্য্যোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন আশ্রমে যাওয়া ঘটিয়া ছিল। চিত্র-শিল্পী নন্দলাল বাবুর নাম আমি বহুবার শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের অবসর কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং কলাভবনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সদা প্রফুল্ল, ধীর স্থির, সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, আত্ম-গোপন করিতে ব্যস্ত এমন একটি লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বলিতে গেলে তিনি একাধারে শিল্পী ও দার্শনিকও বটে। দেখিলাম—যোগীর মত তিনি চিত্র-শিল্পের মধ্যে ডুবিয়া আছেন।

অবসর মত চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করি। তিনি বলিলেন—কলাভবনে পনর জন ছাত্র এবং চারি জন ছাত্রী চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। নিম্ন লিখিত স্থানে তাঁহাদের অঙ্কিত ছবি বিক্রী হয়—কলিকাতা, বাঙ্গালোর, মান্দ্রাজ, মহীশূর, মসলীপত্তন, অন্ধ্র, কাশী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, লাহোর, নাগপুর, সিলোন; বাইরে—চীন, জাপান, বার্লিন, লণ্ডন, প্যারিস, বোষ্টন ও ইতালী। নীচে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা হইতে উপরে আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত এক একখানা ছবির দাম হয়। তাঁহারা প্রকৃতির একটুখানি অনুকরণ করেন—একাডেমিক ভাবে করেন না, অর্থাৎ সাধারণ স্কুলে যেমন ভাবে করে তাঁহারা তেমন ভাবে করেন না। তিনি বলিলেন—"প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করে' সেটা মনে রাখবার চেষ্টা আমরা করি, মনের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে ছবির যেটুকু যোগ তাহাই আমরা ছবিতে দেখাই। সোজাসুজি প্রকৃতিকে সামনে রেখে আমরা ছবি আঁকি না। প্রকৃতিকে আমরা যে অনুকরণ করি—ভাল ছবি আঁকবার জন্য করি না—ষ্টাডীর জন্য করি। ধরুন গাছের ছবি আঁকতে হবে। একাডেমিক ছাত্রেরা গাছকে কপি করবে। তার সঙ্গে হয়ত ভাবও থাকবে, কিন্তু আমাদের আর্টিষ্টরা সে রকম করতে লজ্জিত হবে। তারা নিজের মন থেকে গাছ আঁকবে। গাছের যতখানি তাঁরা assimilate করেছে তার থেকে আঁকবে। যাঁরা গাছকে নকল করতে চান তাঁদের ছবির মধ্যে গাছের সব জিনিষ উঠবে, আর যারা এটাকে ষ্টাডী করে মন থেকে আঁকবে তারা হয়ত গাছের চাকচিক্য ভাব কিংবা পাতার ঝিরঝিরে ভাব ফুটিয়ে তুলবে। এই ভাবে করলে আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে। 'কপি' করলে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। 'একাডেমী' মন থেকে ছবি আঁকে না বল্লে ঠিক বলা হবে না। তারাও আঁকে—প্রকৃতির ষ্টাডী শেষ করে আঁকবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা প্রকৃতির ষ্টাডী ও মন থেকে আঁকা দুইই এক সঙ্গে করি। সেজন্য হয়ত বিশ বৎসরেও প্রকৃতির ষ্টাডী আমাদের শেষ হয় না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"একটা গাছকে, অথবা বাজারে যাচ্ছে এমন একটি মেয়েকে সকল মানুষ কি একই রকম দেখে না? তা যদি হয় তাহলে তাদের সকল ছবিই ত দেখতে একই রকম হবে।" নন্দলাল বাবু বলিলেন—"না, আমরা তা দেখি না এবং আমার বিশ্বাস, —সাধারণ লোকেও সেরূপ দেখে না। একটা গাছকে প্রত্যেক লোক আলাদা আলাদা দেখে। সূর্য্যাস্তের শোভা সকল মানুষের মনকেই আকর্ষণ করে। তাতে আনন্দ হয়, সুখ হয় দুঃখ হয়, অবসাদ হয়—এই রকম হবেই। তাহলে

বুঝতে হবে এটা মনের ব্যাপার। প্রত্যেকের মনের ভাব দৃষ্টে আমরা সূর্য্যাস্তের শোভা দেখি, প্রত্যেক রসের শেষটা আনন্দ। অবসাদ হলেও আনন্দ হতে পারে, দুঃখের বিষয় থাকলেও সেটা আনন্দের বিষয় হতে পারে, কোন জিনিষ যখন ভাল আর্টিষ্টের হাতে পড়বে তখন সেটা আনন্দ দিবেই, এটাকেই বলে—Artistic creation. সৃষ্টি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুখ দুঃখের অধীন থাকবে, সৃষ্টি হলে আনন্দের বিষয় হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু আনন্দই দেয়। সাহিত্যে যেমন গল্প পদ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি আছে আর্টেও সেরূপ আছে। একটা মেয়ে বাজারে যাচ্ছে —আর্টিষ্ট যখন তার ছবি আঁকবে, হুবহু নকল করে সে দেখিয়ে দিতে পারে—লোকটা বাজারে যাচ্ছে কিন্তু ভাল আর্টিষ্টের হাতে পড়লে তার চলন-ভঙ্গী, দৃষ্টির একাগ্রতা—এই সকল ভাব ফুটে উঠবে। যেমন, খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা যে খবর দেয় সেটা শুধু facts কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন সেটা লেখেন তখন সেটা নতুন আকারে সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। ইজিপ্টে বাটনা বাটার ছবি এমন সুন্দর—সকলের চিত্তই তাতে আকৃষ্ট হয়, সেটা যেন একটা কবিতার মত। প্রত্যেক জিনিষকে universalise করা যায় আবার mere factsও করা যায়। একজন আর্টিষ্ট হয়ত facts আঁকবে, আর একজন তাকে universalise করবে। facts হল কপি, সৃষ্টি হল না,—না হলেও সেটা আর্ট হবে কিন্তু ভাল আর্টিষ্ট সে নয়; মনকে appeal করা চাই—সেখানে আর্টিষ্টের বাহাদুরী। সংসারে কবি সৃষ্টি না হয়ে যদি শুধু রিপোর্টার সৃষ্টি হত তাহলে হয়ত আমরা এতটা অগ্রসর হতে পারতাম না।” অসীমের প্রকাশ ছবিতে কিরূপ হয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—“সেটা ব্যক্ত করা যায় না—আর্টিষ্টের তুলি তা ব্যক্ত করবে। আমরা কাউকে তা শেখাতে পারি না, যদি পারতাম তাহলে গুরুদেবও অনেক কবি সৃষ্টি করতে পারতেন। একে বলে প্রতিভা, একটা বালিকা বা যুবতীর আকর্ষণী শক্তি থাকতে পারে, সেটা universal নয়; সেই ভাবটিকে যদি প্রকাশ করা যায় তবে সেটা হবে universal. suggestive ছবি আছে—যেমন চীন দেশীয় ছবি। আকাশ অসীম, একে আঁকা যায় না। আর্টিষ্টকে যদি আকাশ আঁকতে বলা হয় সে একটুকরো কাগজ দেখিয়ে বলবে—এই আকাশ। অন্য একটা জিনিষ দেখিয়ে আকাশ দেখাতে হয়, একটা পাখী এমনি করে আঁকব যার দ্বারা পাখী না দেখে আকাশ দেখা যাবে। এখানে তুলনা দ্বারা আকাশ দেখান হল। Relative দ্বারা absolute বা অসীমকে দেখান হয়। এটা আমাদের কাজ। Form-এর ভিতর দিয়ে আমরা তা করি—সে জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলতেন—আর্টিষ্টের ছবির চেয়ে কবিতা বড়। আমি বলি—তিনি যদি মুখ না ফুটান, শব্দ বের না করেন, তাহলে কি করে ভাব ব্যক্ত করবেন? তাঁর যেমন শব্দ, আমাদের তেমনি form; form-কে আমরা ততটা দেখাই না, form-এর ভিতর দিয়ে অব্যক্তকে যতটা ব্যক্ত করি। আনন্দের ভাব বা দুঃখের ভাব আকাশে থাকতে পারে না। কতকগুলি লাইন আছে যেমন মুখ, বসবার ধরণ-প্রভৃতি দেখিয়ে বলি—দুঃখিত—দুঃখের ভাব form-এর সঙ্গে জড়িত, আমাদের কারবার form নিয়ে, কবির কারবার sound নিয়ে। কবিরা অসীমকে—ভাবকে—form দেন, আমরা form-কে অসীম করি অর্থাৎ অসীমের emotion জাগাই। বিষয়টি ব্যক্ত করা শক্ত। লোকটা দুঃখিত, তাকে আঁকলাম। তার থেকে universal দুঃখের ভাব আঁকবার চেষ্টা করি, কখন feeling থেকে form-এ কখন বা form থেকে feeling-এ আসছি। এখানে form এবং feeling পরস্পর আলাদা করা যায় না। যেমন ষ্টেজে ঢুকলে লোকটিকে চিনতে পারা যায় না, আগের form সরিয়ে ষ্টেজে এক্‌টিং করতে হয়—এও তেমনি।”

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

“কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ

এই ভাবটিকে আপনি ছবিতে কি রূপে প্রকাশ করিবেন?” নন্দলাল বাবু বলিলেন আমি হয়ত ঐরূপ ছবি আঁকবই না, আমাকে এর form খুঁজতে হবে। অনেক feeling ঐ রকম আছে—দেখান শক্ত। আর্টিষ্টরা সে ভার নেবে না,

কবিরা "লাল" দেখাতে পারবে না, আমরা পারব। আপনি যদি demand করেন ঐরূপ ছবি আঁকতে, আমি বলব আর্টিষ্টরা তা করতে বাধ্য নয়, খুব কষ্টসাধ্য জিনিষ হবে এটি করা। যে হিসাবে কবিকে তার কবিতা দ্বারা লাল দেখাতে হয় সেই হিসাবে আমরা ঐরূপ feeling-কে form দিতে পারি বটে কিন্তু সেটা ঠিক নাও হতে পারে। বুদ্ধের form আর্টিষ্ট দেখাতে পারে, কবি হয়ত তা পারবে না, পারতে পারে, খুব কষ্টসাধ্য হবে। আপনি যেরূপ ছবির কথা বল্লেন—সেটা আমাদের subject নয়।" বুদ্ধদেবের ছবি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—"Cultural ইউরোপে বুদ্ধদেবের ছবি খুব appeal করে। ফরাসীর রোঁদা সর্ব্বদা বুদ্ধদেবের ছবি কাছে রাখতেন। নটরাজের মূর্ত্তির উপর তিনি বই পর্য্যন্ত লিখেছেন—এতদূর তাঁর ভাল লেগেছে। একটা বদ্ধ সংস্কারের জন্যই হোক অথবা প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখলে আমাদের ভাল লাগে সে জন্যই হোক আমাদের দেশের সাধারণ লোকের নিকট বুদ্ধ মূর্ত্তি যতটা ভাল লাগে ইউরোপের সাধারণ লোকের নিকট ততটা ভাল না লাগতে পারে।"

অজন্তা গুহার চিত্র সম্বন্ধে বলিলেন—"জাতকের জীবনের কাহিনী বই-এ না লিখে ছবিতে লেখা হয়েছে, বুদ্ধের জীবনের যা-কিছু ব্যাপার সেটা ছবির আকারে বই লেখা হয়েছে। আমার মনে হয় যাঁরা এই সকল ছবি এঁকেছেন তাঁরা প্রকৃতিকে খুব ষ্টাডী না করলে এমন ছবি হতে পারে না। Directly প্রকৃতিকে তাঁরা কপি করেন নাই, এইখানেই আর্টিষ্টের মরণ বাঁচন।"

ভারতীয় চিত্রকলা ও ইউরোপীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে বলিলেন—"ইউরোপীয়েরা সাধারণত প্রকৃতিকে নকল করে। কিন্তু এখন তারা ক্রমশ ঐ পথ ছাড়ছে। কারণ তাতে সৃষ্টির বাধা জন্মে। বস্তুত বড় আর্টিষ্টদের মধ্যে ভারতবর্ষ ও ইউরোপ কোন পার্থক্য নেই। ইউরোপীয়েরা সাধারণত প্রকৃতির irregularity বজায় রাখে, আমরা তাকে ornamental করি। Natural বল্লেই ornamental নয় কিংবা ornamental বল্লেই natural নয়—এটা বুঝায় না। ওদের বিশেষত্ব natural-এ, আমাদের বিশেষত্ব ornamental-এ। Natural যদি ornamental-কে অবজ্ঞা করে অথবা ornamental যদি Nature-কে অবজ্ঞা করে তবে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। দুটি যদি একত্র হয় তা হলেই আর্ট সুন্দর হয়। ইউরোপীয় আর্ট মরল কেন? Sculptor ঠিক ঠিক মানুষ আঁকল, দেখে দেখে repulsion এল, তাই এখন ওরা ornamental করতে চাচ্ছে। Natural-কে বাদ দিয়া ornamental-এর দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে আমাদের আর্টও stiff হয়ে পড়েছে। দুটি একত্র হলে ঠিক আর্ট দাঁড়ায়—ভাবটা বেশ ফুটে ওঠে।"

চিত্র-শিল্পে ফটোর স্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে নন্দলাল বাবু বলিলেন—"ফটো তুলতে হলে light shade-এর setting দরকার। Position অনুসারে ফটো ভাল কি মন্দ দেখায়। ফটো তুল্লেই যে তা ভাল হবে তা নয়। তার ভিতর একটুখানি কারসাজী চাই, এটা ফটোর মধ্যে আর্ট। শুধু ফটো ফটো নয়, সেটা ক্যামেরা। আর্টের উদ্দেশ্য একজনের মনের ভাব অপরের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া। ফটোও এখন সে চেষ্টা করছে। ফটোতে মুখ উঠল কিন্তু খারাপ হয়ে উঠল, তখন ফটোগ্রাফার করে কি? হাত দিয়ে একটু রিটাচ্ করে দিল—দেখতে সুন্দর হল, সেখানে আর্টিষ্ট করবে কি? তারা যে ছবি আঁকবে তাতে শরীর থাকবে, মুখ থাকবে—সব থাকবে—এমন চতুরতার সহিত করবে—অন্যে যখন দেখবে—সে শরীর দেখবে না, আর কিছু দেখবে না—শুধু মুখটা দেখবে। শরীর ও আর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ consciously পেছনে আছে—এটা আর্ট।

সর্ব্ব শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় হিসাবে চিত্র-শিল্পে field কি রকম?" নন্দলাল বাবু বলিলেন—"এখানে মৃত্যু। চীনারা বলে—আর্টিষ্ট হলে সে দরিদ্র হতে বাধ্য। এখানে ইকনমিক সমস্যা সমাধানের প্রশস্ত স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ যে রকম কবিতা লিখছেন—যা দেড়শ কি দুশ বৎসর পরে লেখা উচিত ছিল—যদি তিনি বড় লোক না হতেন তাহলে হয়ত তাঁকে অনাহারে দিন কাটাতে হত। আর্টিষ্টের ভাগ্যে চিরকাল তা হয়ে এসেছে।

সিঁদূরের বেসাতি

মেয়েলি গানের সুর

জসীম উদ্‌দীন

'ও লো সোনার বরণী !
তোমরা সিঁদূর নি নিবারে সজনী।
রাঙা তোমার ঠোঁট রে কন্যা, রাঙা তোমার গাল,
কপালখানি রাঙা নইলে লোকে পাড়ব গাল রে ;—
তোমরা সিঁদূর নি নিবারে সজনী।
সাঁঝের কোলে মেঘ রে তাতে রঙের চূড়া,
সেই মেঘে ঘসিয়া সিন্দুর করছে গুড়া গুড়া।
এই না সিন্দুর পরিয়া নামে আহাশেতে আড়া,
এই সিন্দুরের বেসাতি করতে হইছি ঘরছাড়া॥
কাণা ঘ্যাওয়ায় জিলিক মারে কালা ম্যাঘায় ফাড়ি,
তোমার জন্যে আন্‌ছি কন্যা মেঘ-ডম্বুর শাড়ী।
শাড়ীখানি পর' কন্যা সিঁদূরখানি পর'
আখের পলক দেইখা আমি যাই হাপনার ঘর।'

'থাক থাক বাণিয়ারে নিরালে বসিয়া,
জননীর আগে আমি আসি জিজ্ঞাসিয়া।
—শোন শোন ওহে মা-ধন শুনিয়া ল' তোর কানে,
আমি ত যাব মা-ধন বাণিয়ার দোকানে।
একধামা দাও ধান, আমি কিনিব পুতীর মালা,
আরও ধামা দাও ধান আমি কিনিব হাতের বালা।
বিদেশী বাণিয়া রে, বোঝা তোমার মাথে,
দেখাও দেখি কি কি জিনিষ আছে তোমার সাথে।'

'আমার কাছে সিঁদূর আছে ওই না ভালের শোভা,
তোমার রাঙা ঠোঁটের মত দেখতে মনলোভা।'

'আমরা ত নাহি জানি সিঁদূর কেমনে পরে
আমরা ত দেখি নি সিঁদূর কাহারও ঘরে।'
'সোনার বরণ কন্যা রে, দীঘল মাথার ক্যাশ
সিঁদূর পরাইতে পারি যাও যদি মোর দ্যাশ।'
'শোন শোন বাণিয়া রে, কই তোমার আগে,
তোমার না সিঁদূর লইতে কত দাম লাগে?'
'আমার না সিঁদূর লইতে লাগে হাসি মুখ
আমার না সিঁদূর লইতে লাগে খুসী বুক।'
'নিলাম নিলাম সিঁদূর নিলাম হাসি মুখে কিনি,
আরও কি ধন আছে তোমার আমরা নি তা চিনি!'
'আরও আছে হাতের শাঁখা আছে গলার হার,
নাকের বেশর নথও আছে সোনায় বাঁধা তার।'
'আমরা ত নাহি জানি বাণিয়া, শাঁখা বলে কারে,
—দেখি নাই ত নথের শোভা সোনাবান্ধা তারে।'
'সোনার বরণ কন্যা তুমি সোনার হাত পাও,
শাঁখা যদি না পরিলে কিসের সুখ পাও!'
'সাত ভাই-এর সাত বউ সাত নথ নাকে,
পূব-দুয়াইরা বাড়ী মোদের উজল কইরা থাকে।
শোন শোন বাণিয়ারে, কই তোমার আগে,
তোমার ও না নথ ও শাঁখায় কত দাম লাগে?'
'আমার না শাঁখা লইতে লাগে হাসি মুখ,
আমার না নথ লইতে লাগে খুসী বুক।'
'নিলাম নিলাম নথও নিলাম নিলাম তোমার শাঁখা,
তোমার কথা বাণিয়া রে হৃদে রইল আঁকা।

'ওই বিদেশী বাণিয়া মোরে পাগল কইরা গেছে
আমার মন কাড়িয়া নেছে রে সজনী!
শাঁখা না কিনিতে আমি হাতে বান্ধলাম ডোর,
সিঁথার সিঁদূর কিনে চক্ষে দেখি ঘোর।
নথ না কিনিয়া আমি পথে করনু বাসা,
একেলা কাঁদিয়া ফিরি লয়ে তারি আশা।'

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

(২০)

—নিভা!

—কি বাবা?

—প্রকাশের টেলিগ্রামখানা আর একবার প'ড় তো, কখন এসে পৌছবে লিখেছে?

—আজই রাত্রে এসে পৌছবে। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই। তোমাকে তো পাঁচবার টেলিগ্রামখানা প'ড়ে শোনালুম বাবা!—

—এখন ক'টা বেজেছে?

—পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট।

—তা হ'লে তো আর বিলম্ব নেই বেশী।

—না।

মাষ্টার মশাই অনেকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে চোখ দুটি বুজে কি ভাবতে লাগলেন। খানিক পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—নিভা, নির্ম্মল বড় অসুস্থ অবস্থায় আসছে, আমার উচিত ছিল ষ্টেশনে গিয়ে তাদের নিয়ে আসা।—কিন্তু আমি তো একেবারে মৃত্যু-শয্যায় পড়ে—

নিভা ব্যাকুল হ'য়ে উঠে বললে—কী যে বলো বাবা!—ডাক্তার বাবু ব'ললেন, আজকে তুমি অনেকটা ভাল আছো—ওদের জন্য অত ভাবছ কেন, প্রকাশদা' যখন সঙ্গে আছে তখন ঠিক সব বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে আসবে—তোমার কিছু ভয় নেই!

মাষ্টার মশায়ের মুখখানি যেন একটু উজ্জ্বল হ'য়ে ঠ্'ল, বললেন—হ্যাঁ, প্রকাশ আছে বটে। সে ঠিক সব গুছিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু একলাটি বেচারার বড় কষ্ট হবে যে!...আচ্ছা, ভোলানাথকে একবার ষ্টেশনে যাবার জন্য অনুরোধ করলে হতো না?—

—তা, অনুরোধ করলে হয় ত যেতে পারেন, কিন্তু বলবে কে? আমি ত' বাপু পারবো না। একেই তিনি এতদিন প্রকাশদার হয়ে যে খাটুনী খাটলেন তা ব'লে শেষ করা যায় না—তার উপর আবার—

—তুই একবার তাকে আমার কাছে ডেকে দে না—আমি অনুরোধ করছি—

—তুমি কি সবাইকে প্রকাশদা' পেলে নাকি বাবা, যে তুমি যা হুকুম করবে তাই শুনবে?

—আহা, ও ছেলেটি বড় ভাল, প্রকাশের ভাই কিনা? শুনবে শুনবে—আমার কাছে একবার ডেকে দে না—

—তিনি যে এইমাত্র উমাদিকে বাড়ীতে রেখে আসতে গেলেন।

—ওঃ! তা হ'লে এখনি আসবে—

—না, তাঁর আসতে একটু দেরী হবে। তিনি বলে গেছেন যে, দিদিকে পৌছে দিয়ে ব্যায়াম-সমিতি ঘুরে তবে আসবেন।

মাষ্টার মশাই আর কোন কথা বললেন না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে নির্জ্জীবের মতো বিছানায় পড়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন—এই উমা মেয়েটি নারী-রত্ন—একে আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি, উত্তরকালে সমস্ত জাতিকে এর জন্য দণ্ড দিতে হবে নিভা! নাঃ আমি এ সমাজের মধ্যে বাঁচতে চাই নি।

—তুমি চুপ কর বাবা, ও সর্ব্বনাশ ত আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। তুমি আর ও নিয়ে উত্তেজিত হবে না, ডাক্তার বাবু বার বার করে নিষেধ ক'রে গেছেন।

—না না, আমি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছি নি নিভা, আমি কেবল এই কথাটা ভাবছিলুম যে, এতগুলো তরুণ প্রাণকে কেন আমরা একটা নিষ্ঠুর প্রথার কুসংস্কারের বশে জীবনের সকল আনন্দ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করে রেখেছি। এই অন্যায় অত্যাচারের পাপ কি আমাদের সইবে?

—তোমার পায়ে পড়ি বাবা, এই দুর্ব্বল শরীরে তুমি কেন ও সব আলোচনা করছো?

—প্রকাশ আমার ছেলের অধিক কাজ করছে, ওকে আমি বড় ভালবাসি নিভা, তোর মাও বড় ভাল বাসত। তাই বিভাকে ওর হাতেই সে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রকাশের পিতার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সে বিভাকে গ্রহণ করলে না এবং তার একমাত্র পুত্রকে অসুখী করে রাখলে ...

—আর তুমি কি তোমার মেয়ের রাতারাতি অন্যত্র বিবাহ দিয়ে তাকে খুব সুখী করেছো মনে কর বাবা?

—কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করছিস? আমি ত তাকে অতি সুপাত্রে সম্প্রদান করেছি। তার ত' অসুখী হবার কথা নয়।

—তা হলে প্রকাশদার বাবা প্রকাশদাকে অসুখী করে রাখলেন এমন কথা বলছো কেন? যথাসময়ে দেখে শুনে তিনিও একটি সুপাত্রীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়ে ছেলেকে সুখী করবেন।

—কিন্তু, বিভা যে তাকে বরাবর দেখছে, সে তার স্বভাব ভাল রকম জানতো, বিভাকে বিবাহ করলে সংসারে প্রকাশ যেমন সুখী হত এবং শান্তিতে থাকতো, তেমনটি হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, এই অসুবিধার কথাটা বা সুবিধার হিসাবটা কি দিদির সম্বন্ধেও বিবেচনা করা যেতে পারত না?

নিভার মুখে এ কথা শুনে মাষ্টারমশাই স্তম্ভিতের মতো চুপ করে প'ড়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন—আমার অন্যায় হয়েছে নিভা, কিন্তু তা ছাড়া আর কি উপায় ছিল মা বল্ ...

এবার নিভা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললে,—দিদি যদি আপনার মেয়ে না হয়ে ছেলে হত, তাহলে সে নিশ্চয় প্রকাশদার মতো অপেক্ষা করে থাকত। মেয়ে বলেই ত আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করলে না। ... বিবাহ যেন আমাদের মৃত্যুর চেয়েও নিশ্চিত!

মাষ্টারমশাই এ কথা শুনে যেন চমকে উঠলেন, ক্ষণকাল তাঁর মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুল না। বহুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তিনি তাঁর এই কিশোরী কন্যার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন। তার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন কেবলই ঘুরে ফিরে আসছিল এই যে, এর মত একজন সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা—জীবনের কোনও সমস্যাই এখনও যার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি—সে কেমন করে এ রহস্যের সন্ধান পেলে? ব্যাকুল হয়ে তিনি নিভাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, তোর এমন মনে হয় মা, তোর দিদি কি তোকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেছিল? তবে কি বিভা এ বিবাহে সুখী হতে পারে নি?

—কেন তুমি এ নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছ বাবা? দিদি ত আমাকে সে রকম কিছু লেখে নি, বরং তার প্রতি পত্রে নির্ম্মল বাবুর সুচরিত্র ও উদার মনের উচ্ছ্বসিত প্রশংশাই দেখতে পাই! আমার ত মনে হয় সে অসুখী হয় নি! এ কি! তুমি এত ছট্‌ফট্ করছ কেন? একটু চুপ করে স্থির হয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর ত।

নিভা মাষ্টারমশায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখে বললে—এ কি, সাড়ে ছটা বেজে গেছে দেখছি, তাই ত, ভোলাদা এখনও এল না, সাড়ে ছ'টায় সবুজ শিশির ওষুধটা একদাগ দিতে বলে গেছেন, এই বেলা খাইয়ে দিই নইলে বাবার যে রকম ঢুল আসছে, ঘুমিয়ে পড়লে আর খাবেন না।

ব'লতে ব'লতে নিভা উঠে সবুজ শিশি থেকে একদাগ ওষুধ ঢেলে নিয়ে তার বাবাকে খাইয়ে দিলে। তারপর তাঁর শিয়রের কাছে বসে আবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ও আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভোলানাথ কখন যে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সে ঘরে এসে ঢুকেছিল নিভা কিছুই টের পায় নি, ভোলানাথ

পিছন দিক থেকে গিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে যখন ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলে—এখন কেমন দেখছেন? নিভা প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর লজ্জিত হয়ে নতমুখে বললে—ভালই ত মনে হচ্ছে।

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করলে—ওষুধটা কি খাইয়েছেন?

নিভা সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

তারপর দুজনে রোগীর দুদিকে অনেকক্ষণ নীরবে নতমুখে বসে রইল। দু'জনের মনেই তখন এই কথাটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল,—নাঃ, এমন ক'রে আর চলে না, প্রকাশদা' ফিরলে বাঁচি!

ভোলানাথ প্রথমটা অস্থির হয়ে উঠে একটু উসখুস্ ক'রে মাষ্টারমশাইকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলে, তারপর বললে, যেন আপন মনেই—ঘুমিয়ে পড়েছেন!

কথা বলবার এ সুযোগটাকে নিভাও উপেক্ষা করলে না, তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—না, ওটা ঠিক ঘুম নয়, উনি আজ প্রায়ই মাঝে মাঝে ওই রকম ঝিমিয়ে পড়ছেন। এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না!

ভোলানাথ অবাক হয়ে একবার নিভার মুখের দিকে চেয়ে দেখেই তৎক্ষণাৎ মুখ নীচু করে বললে—রোগীর অবস্থা আপনি অনেকটা বুঝতে পারেন দেখছি! সত্যই এটা ঘুম নয়, এটাকে বলে ড্রাউজিনেস্। রোগীর পক্ষে মোটেই সুলক্ষণ বলা যেতে পারে না।

তারপর ভোলানাথ মাষ্টারমশায়ের ডান হাতটা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখে বললে—আজ যদিও জ্বর নেই, কিন্তু নাড়ী বড় দুর্ব্বল।

—সেই জন্যই ত আমার এত ভয়, আজ আবার প্রকাশদা' ফিরছেন দিদিকে আর অসুস্থ জামাইবাবুকে নিয়ে—কে জানে কি অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসছে ওরা!

কি যেন একটা অজানা আশঙ্কায় নিভার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তার সুন্দর মুখখানি আজ বড় কাতর ও ম্লান দেখাচ্ছিল।

ভোলানাথ এইটে ভেবে ভারী আশ্চর্য্য বোধ করছিল যে, অমঙ্গলের দুঃসংবাদ কেমন করে পূর্ব্বাহ্নেই এই মেয়েটির অন্তরে তার অন্ধকার ছায়া পাত করলে! উমার কাছে প্রকাশের যে টেলিগ্রাম এসেছে তাইতে ভোলানাথ জানতে পেরেছে যে, প্রকাশ শুধু বিভাকে নিয়েই ফিরছে, নির্ম্মল আর নেই!

নিভা হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠে বললে—তাদের আসবার প্রায় সময় হয়ে এল, বাবা সন্ধ্যে থেকে কেবলই আমাকে বলছিলেন যে, ওদের আনবার জন্য কাউকে ষ্টেশনে পাঠান উচিত, নইলে প্রকাশ একলা রোগী নিয়ে সামলাতে পারবে কি?

ভোলানাথ কথাটা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—হ্যাঁ, আমি এখনি যাচ্ছি, উমা বলেছে যে সে এসে পৌঁছলেই আমি ষ্টেশনে চলে যাবো, তাই আমি অপেক্ষা করছিলুম।

নিভা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—উমাদি' কি আজকে আবার একবার আমাদের বাড়ী আসিবেন?

—হ্যাঁ।

—কেন, রাত্রে আবার কষ্ট করে আসবেন যে?

ভোলানাথ এ কথার কোনও জবাব খুঁজে পেলে না, কী যে বলবে ভেবে যখন কিছুই ঠিক করতে পারছে না, সেই সময় নিভা বললে—ও, বুঝিছি, দিদি আসছে শুনে উমাদি বোধ হয় তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন!

ভোলানাথ যেন অকূলে কূল পেলে! তাড়াতাড়ি বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে বোধ হয়।

এই সময় বাইরে থেকে উমার গলা পাওয়া গেল—ভোলাদা!

নিভা ও ভোলানাথ প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল—ওই যে! নাম করতে না করতেই এসে হাজির!

উমা ঘরে ঢুকে ভোলানাথকে বললে—ওঠো ওঠো শীগ্‌গির যাও, আর সময় নেই, আমি বাবাকে বলে আমাদের মোটর নিয়ে এলুম, রামলাল গাড়ী নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি ওই গাড়ী নিয়ে এখনি ষ্টেশনে চলে যাও, দাদাকে আর বিভাকে নিয়ে এসো।

ভোলানাথ একটা মৃদু 'আচ্ছা' ব'লে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

উমা বেশ করে খানিকক্ষণ মাষ্টারমশায়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিভাকে জিজ্ঞাসা করলে—কতক্ষণ ইনি এমন

নিঃঝুম হয়ে আছেন নিভা ?

নিভা বললে—তা প্রায় আধ ঘণ্টা হবে দিদি।

—সাড়ে ছ'টায় একদাগ ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল কি ?

—হ্যাঁ, আমি নিজে খাইয়েছি।

উমা আর কিছু বললে না, ক্ষণকালের জন্ত সে যেন কেমন অন্তমনস্ক হয়ে পড়ল,তারপর হঠাৎ উঠে নিভাকে এক-হাতে সস্নেহে জড়িয়ে অপর হাত ধরে সে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে বললে—তুমি এখন বড় হয়েছ বোন, তোমার বেশ বুদ্ধি বিবেচনা আছে আমি দেখেছি, তাই তোমাকে বলতে সাহস করছি, জানি তুমি শুনে চেঁচামেচি করে কেঁদে বাড়ী-মাথায় করবে না।—তোমার জামাইবাবু আর নেই, কিন্তু—

নিভা এ কথা শুনে একেবারে বজ্রাহতার মত শিউরে কেঁপে উঠল।

উমা তাড়াতাড়ি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তার মাথাটি নিজের কাঁধের উপর টেনে নিয়ে বললে—এ যে বিভার কত বড় বিপদ, সে আমি যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝছি, তুই তার কণামাত্রও বুঝবি নে নিভা, হিঁদুর মেয়ের এত বড় সর্ব্বনাশ বোধ হয় আর কিছুতে হয় না, কিন্তু তবু আমি এ কথা বেশ জোর করে বলতে পারি বোন, যে, বিভা আজ বেঁচে গেল, দুঃখ করিস্ নি ভাই, সবই ত জানিস্, আমি বলি কি তার পক্ষে এই ভাল—

নিভার দুই চোখ দিয়ে তখন অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়ছিল, উমা আপন বস্ত্রাঞ্চলে তার চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে বললে—চুপ কর বোন্, যা হবার হয়ে গিয়েছে, সে তো আর ফিরবে না, এখন মাষ্টারমশাই যাতে ভালয় ভালয় সেরে ওঠেন সেই চেষ্টা করতে হবে ত, উনি যাতে এ খবর না পান সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, খুব সাবধান।

নিভা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে উমার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনে অবিলম্বে নিজেকে সামলে নিলে।

এমন সময় রাস্তায় একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল, উমা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—ওই বুঝি ওরা এল, আমাদের গাড়ীর হর্ণ শোনা যাচ্ছে, তুই যা ভাই, মাষ্টারমশায়ের কাছে বস্‌গে যা, আমি গিয়ে তোর দিদিকে নাবিয়ে নিয়ে আসছি—বলতে বলতে উমা বাইরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল, নিভা তার বুকের ভিতরের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সজোরে চেপে ধীরে ধীরে তার রুগ্ন পিতার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হল।

—ক্রমশ

ডাক-পিওন

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরদিন প্রত্যুষে দু'নলা একটি বন্দুক হাতে লইয়া সাহেবী পোষাক পরিয়া সুরেন্দ্রনাথ শীকারে বাহির হইয়াছিল। গ্রামে হঠাৎ সাহেব দেখিয়া কৌতুহলী ছেলে-বুড়ার দল সেই যে সকাল হইতে তাহার পিছন ধরিয়াছিল, বেলা প্রায় এগারোটার সময় শীকার শেষ করিয়া সুরেন্দ্র যখন কাছারিতে ফিরিল, দেখা গেল তখনও তাহারা পিছন ছাড়ে নাই। তাহাদেরই একজনের কাঁধে বন্দুক। বন্দুকটা কাঁধে লইতে প্রথমে কেহই রাজি হয় নাই, পরে অনেক কষ্টে সাহসী একটা ছোক্‌রাকে রাজি করানো হইয়াছে। আর একজনের হাতে নিহত কয়েকটি পক্ষী-শাবক ; মাথাগুলা নীচের দিকে এবং পাগুলা একত্রিত করিয়া হাত দিয়া ঝুলাইয়া আনিতেছে। একটি ঘুঘুর ঠোঁট দিয়া তখনও টপ্ টপ্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল।

কাছারির দরজায় আসিবামাত্র গোমস্তা কাশীনাথ সকলকে একপ্রকার ধমক দিয়াই তাড়াইয়া দিল।—'উনি কি বাঘ না ভল্লুক যে, পিছু পিছু ছুটে এসেছ সব? বুড়ো মিন্‌ষে নন্দ, আক্কেলের মাথা কি তুমিও খেয়েছ নাকি? তাড়িয়ে দেবে কোথায়, না নিজেও ছুটে এসেছ পিছু পিছু! ছি, ছি!'

সুরেন্দ্রনাথ তখন মাথার টুপি খুলিয়া চেয়ারে বসিয়া রুমাল দিয়া হাত-মুখ মুছিতেছিল, পিছন দিক হইতে কোটালকে বাতাস করিতে বলিয়া কাশীনাথ তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—'সর্ব্বৎ এক গ্লাস?'

সুরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া না বলিতেই সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—'চা?'

হাতের রুমাল নাড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিল, 'হ্যাঁ তা বরং হতে পারে। এ আর এমন কী দেখছ কাশীনাথ, এ রকম 'এক্সকার্‌শান্' আমার 'হ্যাবিট্' হয়ে গেছে। এক একদিন সকালে বেরিয়ে দশ মাইল কুড়ি মাইল—বাস্ সেই সন্ধ্যেয় ফিরি।...কিন্তু ছাখ, জিনিষটে যেন বেশ ভাল হয়। কুক্...

কাশীনাথ বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কূপের জলেই চা বেশ ভাল হবে। তারণ, ও হে ও তারণ—শুনছ?'

রান্নাঘরে বসিয়া তারণ পড়্ পড়্ করিয়া হুঁকা টানিতেছিল, ডাকটা সে প্রথমে শুনিতে পায় নাই, আরও বার কয়েক ডাকাডাকির পর সে রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে মুখ বাড়াইয়া মুখের অবশিষ্ট ধোঁয়াটুকু ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'কি—!'

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে কাছে ডাকিয়া মাংস কেমন করিয়া রান্না করিতে হইবে বুঝাইয়া দিতেই জোড় হস্তে হুঁ হাঁ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে আবার রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

সুরেন্দ্র কাশীনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, 'ইংরেজি তুমি জানো না, না?'

হঠাৎ ইংরেজি জানার কথা উঠিল কেন বুঝিতে না পারিয়া কাশীনাথ প্রথমটা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ঢোঁক গিলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে না, ইংরেজি জানার কথাই যখন উঠলো তখন শুনুন সে একটা ভারি মজার গল্প আছে আমাদের বংশে। আমাদের ঠাকুর-মশাই-এর নিষেধ, বুঝলেন? বেশি দিনের কথা নয় —আমার বাবার আমলে ... এই এই গেল গেল গেল গেল—'

কাছারির দরজা খোলা পাইয়া কাহার না জানি একটা গাই কোন্ সময় উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, প্রাচীরের ধারে কলাগাছের চারায় মুখ দিতে যাইবে, এমন সময় কাশীনাথের নজর হঠাৎ সেদিকে গিয়া পড়িতেই গল্প রাখিয়া তাড়াতাড়ি গাই তাড়াইবার জন্য হেট্ হেট্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'শীকারেও আপনার হাত ত দেখি বেশ! তা এদিক পানে পাখীর অভাব নেই। পাহাড়ে জঙ্গলে এত পাখী ঘুরে বেড়ায় যে তাদের নামই জানিনে আমরা।'

সুরেন্দ্রনাথের চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, 'উঃ! বিস্তর! বিস্তর! এমন জানিনে, জানলে আরও টোটা নিয়ে যেতাম।'

পাখীর নামে কাশীনাথের বাবার আমলের মজার গল্প চাপা পড়িয়া গেল। তা যাক। শুনিবার আগ্রহ সুরেন্দ্রনাথের ছিল না।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কাশীনাথ বলিল, 'তা আপনার এ শীকারগুলি হলো কোন্‌খানে?'

সুরেন্দ্রনাথ বলিল, 'তোমাদের ওই মন্দিরের কাছাকাছি—। 'ফায়ার' একটাও 'মিস্' করিনি, তবে এই ঘুঘুটা বড় হায়রাণ করেছে। মন্দিরের ঠিক ওই ভাঙা চত্বরটার ওপর বসেছিল ঘুঘু কখ্‌খনো একা থাকে না। জানেন ত?'

কাশীনাথ তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে হাঁ', জানি বই কি। পাড়াগাঁয়ের মানুষ,—তা আর জানি নে?'

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিল, 'করলাম ফায়ার্। একটা উড়ে গেল আর একটার লাগলো পায়ে। উড়ে বসলো গিয়ে মন্দিরের দরজায়। আবার ফায়ার্! কিন্তু 'সেকেণ্ড্ টাইমে'র ফায়ার্‌টা বোধ করি 'মিস্' করলো। জোড়াকে জোড়াই উড়লো। তারপর পিছু পিছু ওদের ঘুরে ঘুরে হায়রাণ! পায়ে গুলি খেয়ে এ ঘুঘুটা আর বেশিদূর উড়তে পারল না, চক্কর দিতে দিতে এসে' বসলো ফের—মন্দিরের চুড়োর ওপর যে ত্রিশূলটা আছে, ঠিক তার মাথায়। বাস্! লাষ্ট্ ফায়ার্! যেই গুলি খাওয়া আর মন্দিরের গা বেয়ে ঝটপট্ ঝটপট্ করে' গড়াতে গড়াতে 'জাষ্ট্ অন্ দি চৌকাঠ্ অভ্ দি টেম্প্‌ল্'! ঈস্! রক্তে একেবারে মাখামাখি! দেখুন না—মাথাটা গেছে উড়ে, সারা রাস্তা ঠোঁট দিয়ে টপ্ টপ্ করে' রক্ত গড়াতে গড়াতে এসেছে। যেমন কষ্ট দিয়েছিল তার প্রতিফল একেবারে হাতে-হাতে।'

কাশীনাথ এইবার একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'বিশ্বনাথের মন্দিরে গুলি করাটা কিন্তু ভাল হয় নি।'

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, 'ড্যাম্ ইট্! হিন্দুর ছেলে—আমারও একবার মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু দেখুন, ও সব হচ্ছে গিয়ে মিথ্যে প্রেজুডিস্। যাক্, ওসব বুঝবেন না আপনি। যাক্—তাতে আর এমন কী হয়েছে বলুন! আমি ত' আর বিশ্বনাথের গায়ে গুলি চালাই নি। তারপর ... কই চা হলো—চা?'

বলিয়া কথাটাকে সে তাহার নিজের কাছেই অনেকখানি হাল্‌কা করিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

কাশীনাথ চা চা করিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া গেল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আনছে। কিন্তু হাঁ, জয়রামকে দেখলেন না সেখানে? ও ত' ঠিক ওই সময়েই পূজো করতে যায়।'

'কালকার সেই জয়রাম?'—সুরেন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'কই না। তাকে ত' দেখলাম না।'

কাশীনাথ একটুখানি চিন্তিত হইয়া পড়িল; নীচেকার ঠোঁটটা উপরের কয়েকটা দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কি যেন ভাবিল। বলিল, 'তা হবে হয়ত' আপনি যাবার আগেই ও পূজো সেরে' চলে' গেছে। অত সহজে কি আর ... তা বিশ্বেস নেই, ব্যাটার আবার মাথা গরমের ছিট্ আছে কিনা একটুখানি।'

সুরেন্দ্রনাথ বলিল, 'ছাড়তে ওকে হবেই। মেলা আমি আর একটাও হাত ছাড়া করছিনে বাবা! সুরুইএর পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় এ বছর কত আদায় হয়েছে জানেন? শুনলে অবাক্ হয়ে যাবেন—তিন দিনে—তিন আটে—চব্বিশ শ' টাকা। একেও আমি ঠিক অমনি জাঁকিয়ে তুলব দেখবেন।'

পরামর্শটি কাশীনাথেরই দেওয়া। কাজেই

আত্মম্ভরিতায় উৎফুল্ল হইয়া সে একটুখানি মুচকি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'বলেছি ত' বাবা অনেকদিন থেকেই।—গোটা-দুই ঝুমুর, একটি বাঈ-নাচ—বেশ ভাল দেখে, আর যাত্রা-টাত্রা যদি লাগিয়ে দেন ত' কথাই নেই—সারা জেলার লোক যদি ভেঙে এসে না পড়ে ত'—কাশীনাথ এই একদিকের গোঁফ দেবে কামিয়ে!'

কাশীনাথ তাহার গোঁফে হাত দিতেই তারণ আসিয়া টেবিলের উপর চায়ের বাটি নামাইয়া দিয়া গেল।

বৃদ্ধ কোটাল তখনও সুরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পাখা চালাইতেছিল। তাহাদেরই পিয়ারফুটি গ্রামে হঠাৎ এত বড় একটা আনন্দের আয়োজন হইতেছে শুনিয়া আনন্দে সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ঈষৎ হাসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে পশ্চাৎ দিক হইতে সহসা বলিয়া উঠিল, 'তা এই বছর থেকেই হুজুর ...'

কাশীনাথ বলিল, 'দেখছেন, দেখছেন, এরই মধ্যে ব্যাটার ফুর্ত্তি দেখছেন —!'

চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুরেন্দ্র বলিল, 'হ্যাঁ হবে হবে, এই বছর থেকেই হবে।'

বুড়ার চোখ দুইটা হঠাৎ যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে হইল জীবনে সে যেন তাহার বহুদিন পরে ঝুমুর ও বাঈ-নাচ ইহারই মধ্যে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

কাশীনাথ আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সহসা বাহিরের দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়িবার শব্দ হইতেই তাহার আর কিছু বলা হইল না, তাড়াতাড়ি উঠান পার হইয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া দিতেই মোটা একটি লাঠি হাতে লইয়া গৌরবর্ণ জীর্ণ শীর্ণ যে ব্যক্তিটি আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার আগমন যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আকস্মিক।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি যে, হঠাৎ? পোষ্টাপিসের কোনও কাজ-টাজ ...'

ফাল্গুনের শেষে রৌদ্রের তেজ ইহারই মধ্যে বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। এই পথটুকু হাঁটিয়া আসিয়াই লোকটির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না; দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি একটুখানি বসিতে পাইলে বাঁচেন। ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত ক্ষীণ অস্বাভাবিক কণ্ঠে একবার না বলিয়াই তিনি মুখ তুলিয়া কাশীনাথকে কি যেন প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ সাহেবী পোষাক-পরা সুরেন্দ্রনাথের উপর নজর পড়িতেই বলিলেন, 'এই যে!'

তাহার পর ধীরে ধীরে অতিকষ্টে উঠানটি পার হইয়া আসিয়া, লাঠিসমেত হাতখানি একবার কপালে ঠেকাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানেই চালার একটা খুঁটি ঠেস দিয় তিনি বসিয়া পড়িলেন।

সুরেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল অনেকক্ষণ, প্রতিনমস্কার করিয়া কোটালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আসন এনে' দে।'

পেয়ালার চাটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নাম?'

'নাম—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী।'

বাকি পরিচয়টুকু কাশীনাথ বলিয়া দিল, 'এখানকার পোষ্ট-মাষ্টার। ... তা আপনি হঠাৎ কি মনে করে?—এনেছিস? বসুন বসুন, মাটিতে কেন, এইটের ওপর চেপে বসুন।'

সতরঞ্চটা কাশীনাথ সেইখানে বিছাইয়া দিয়া তাঁহাকেও বসাইল, নিজেও বসিল।

চক্কোত্তি-মশাই কিয়ৎক্ষণ পরে একটুখানি সুস্থ হইয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখের পানে মুখ তুলিয়া তাকাইলেন, এবং কোনরূপ ভনিতা না করিয়াই বলিয়া বসিলেন, 'জয়রামকে তুমি বিশ্বনাথের পুজো করতে নিষেধ করেছ বাবা?—বয়েসে তুমি অনেক ছোট, তুমি বললাম, কিছু মনে করো না।'

সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিল, এবং সে হাসির অর্থটুকু বুঝাইয়া দিল কাশীনাথ। বলিল, 'বুঝলাম। পোষ্টাপিসের কাজকম্ম কিছু নয়, তারই বুঝি ওকালতি করতে এসেছেন?'

চক্কোত্তি-মশাই মুখে তাঁহার একটুখানি বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কাশীনাথের দিকে মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, 'অনেক দিনের পুরু চামড়া কাশীনাথ, ভেদ করতে একটু-খানি কষ্ট হবে।'

বলিয়াই তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সুরেন্দ্র-নাথকে প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু কাজটা কি তোমার ভাল হলো বাবা?'

সুরেন্দ্রনাথ তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'তা নিজের ভাল আমার একটুখানি হলো বই কি।'

'কি রকম?'

'পিয়ারসুটির মুনফা যা আদায় হয় তাতে আমার বিশেষ কিছু থাকে না, মেলাটা হাতে এলে এবার কিছু থাকবে।'

অক্ষয় বলিলেন, 'না এলেও তোমার কোনোদিন অচল হয় নি, কিন্তু ওর যে চলবে না বাবা!'

সুরেন্দ্রনাথের মুখের চেহারা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল, 'কার চলবে না চলবে সে কথা ভেবে অস্থির হলে আমাদের চলেনা অক্ষয়বাবু। তবে আমার যেমন চলছে, এতদিন যে রকম ভাবে চলে এসেছিল, তার চেয়ে ভাল চালাতে চাই।'

অক্ষয় একটুখানি থামিয়া মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'তার জন্যে তোমারই একজন দরিদ্র প্রজা না খেয়ে মারা যাবে—তাও তুমি দেখবে না?'

সুরেন্দ্রনাথ বাঁ হাত দিয়া তাহার গলায় বাঁধা 'নেক্-টাই'টি খুলিয়া ফেলিল। বলিল, 'মারা যখন যাবে তখন দেখব,—এখন নয়।'

এই বলিয়া খেলাচ্ছলে সিল্কের রঙিন নেক্‌টাইটি সে ডান হাত দিয়া টানিয়া আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'দেখুন না খেয়ে মারা যেতে বড় একটা কাউকে দেখিনি আজ পর্য্যন্ত। একটুখানি চেষ্টা-চরিত্র করলেই দু'বেলা দু'মুঠো খেতে লোকে পায়। যাক্, অনেক বেলা হয়েছে, আপনাকেও হয় ত হাঁটতে অনেকখানি হবে, আমারও এখনও স্নান হয় নি, আজ উঠি।'

কাশীনাথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সকাল থেকে ঘুরে' ঘুরে' ··· অভ্যেস ত' নেই কখনও ··· মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। চান-টান করে' একটুখানি ···'

চক্কোত্তি-মশাই মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'হুঁ। বিশ্বনাথের জমিজমা—'

কথাটা তাঁহার আর শেষ হইতে পাইল না, কাশীনাথ বলিল, 'আ হা-হা-হা-হা, সে কি আজ নাকি? সে ত' খাস্ করে' নেওয়া হয়েছে কবে! সেটেল্‌মেন্টের রেকর্ডে পর্য্যন্ত ··· তা সে হতভাগা পাগ্‌লা কি আর ...'

অক্ষয়ের গলার আওয়াজ ইহারই মধ্যে কখন্ না জানি ভারি হইয়া উঠিয়াছিল, হেঁটমুখে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'পাগল! হ্যাঁ, পাগল! পাগল না হ'লে কি আর ··· কাল থেকে' শুনে অবধি রাঁধেওনি খায়ওনি পড়ে' পড়ে' সারারাত কেঁদেছে না কি করেছে কে জানে! সকালে ডাকঘরে গিয়ে বলে, বিশ্বনাথের পূজো আর সে করবে না; পূজো করতে আজ সে যায়ও নি। শেষে অনেক করে' বলে'-কয়ে এতক্ষণে পাঠিয়ে তবে এই আসছি এখানে। যাক্, তা হ'লে কাল থেকে পূজোও আর সে করবে না—কি বল?'

কাশীনাথ বলিয়া উঠিল, 'কাল থেকে? তা বেশ, বেশ, কাল থেকে' কাল থেকেই। পূজো করবার লোকের অভাব হবে না, ক—ত লোক আছে, এই যে তারণ, তারণই পারবে আমাদের, কি বল হে, তারণ! তারণ!

এই বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে মুখ বাড়াইয়া পাচক ব্রাহ্মণকে প্রাণপণে ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল।

কিন্তু তারণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ বলিল, 'পূজো করতে ঠিক যে আমি নিষেধ করেছি—তা করিনি বোধ হয়। পূজো সে যদি করে ত' করতে পারে, তার জন্য মাইনের বন্দোবস্ত আমি করে' দেব।'

চক্কোত্তি-মহাশয় আর-কিছু শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। নীরবে শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া ধীরে-ধীরে তাঁহার লাঠিগাছটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অক্ষয়ের জন্য গ্রামের যে ছেলেটি রোজ রান্না করিয়া দেয় তাহার নাম প্রমথ। নিতান্ত ছেলেমানুষ, বয়স পনর-ষোলোর বেশি নয়, আপনার জন বলিতে কেহ কোথাও নাই, লেখাপড়াও জানে না, তাই সে তাহার জীবনের প্রারম্ভ হইতেই ইহার-উহার দুয়ারে কাজকর্ম্ম করিয়া কোনোরকমে দিন চালায়। কিন্তু ছেলেটি বড় ভাল। অক্ষয় সেই যে বেলা বারোটার সময় জয়রামকে পূজা করিতে পাঠাইয়া

নিজেও কোথায় 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেলেন, জয়রাম ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। প্রমথ তাহার রান্না শেষ করিয়া ক্রমাগত ঘর-বার করিতে লাগিল। পোষ্টাপিসের ছোট টাইমপিস্ ঘড়িটিতে একটা বাজিল দুইটা বাজিল। চক্কোত্তি-মশাই বাহির হইবার পূর্ব্বেই বিহারী-রানার্ ডাকের থলিটা ফেলিয়া দিয়া দূরের আরও দুটা ডাকঘরের ডাক বিলি করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানকার ডাক লইয়া সে চলিয়া গেল। ঝুম্ ঝুম্ করিয়া তাহার ঘুঙুরের শব্দ হইতেই প্রমথ আবার ডাকঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া জয়রাম একাকী বসিয়া চিঠি বাছিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু যে এখনও এলেন না, কোথায় গেলেন একবার—'

জয়রামের এতক্ষণে হুঁস্ হইল। মুখ তুলিয়া একবার ঘড়িটার পানে একবার প্রমথর পানে তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁরে তাইত'! আচ্ছা, দরজাটা বন্ধ কর্—দেখি আমিই একবার যাই।'

বলিয়া জয়রাম তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া ডাকঘরের বাহিরে আসিয়া গ্রামের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিয়দ্দূর গিয়া মনে হইল, গ্রামে একমাত্র তাহার বাড়ী ছাড়া কোনদিনই কোনও প্রয়োজনে কাহারও কাছে তাঁহাকে যাইতে দেখা যায় না, সুতরাং গ্রামে তাঁহার সন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। তিনি তাহাকে পূজা করিতে পাঠাইয়া নিজেও হয়ত আবার বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, রৌদ্রের জন্য হয়ত ফিরিতে পারেন নাই, হয়ত সেইখানেই হঠাৎ তাহার হাঁপানির টান্ বাড়িয়াছে। কথাটা মনে হইতেই জয়রাম ভাবিল, ছি ছি ভারি অন্যায় হইয়া গেছে, এতক্ষণ তাহার যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ডাকঘরের কাজ ফেলিয়া কেমন করিয়াই বা যায়—এমনি সব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দিরের দিকে চলিতে লাগিল। রৌদ্রের তাপে পায়ের তলার মাটি তখনও গরম।

পাহাড়ের কাছাকাছি শাল-বনের ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। নববসন্তে শাল-মহুয়ার ফুল ফুটিয়াছে; বহুদূর হইতে বাতাসে তাহার গন্ধ ভাসিয়া আসে।' জয়রামের দৃঢ় বিশ্বাস, এইখানে—এই সুস্নিগ্ধ শ্যামল বনানীপ্রান্তে অক্ষয় কোথাও হয়ত বিশ্রাম করিতেছেন, কিন্তু মন্দিরের কাছাকাছি আগাইয়া গিয়া দেখে, কোথাও কেহ নাই, জনহীন বনপ্রান্ত পাখীর কলরবে মুখর। শূন্য মন্দিরের চৌকাঠের কাছে রক্তটা তখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই,—শুকাইয়া জমাট হইয়া রহিয়াছে, আর তাহারই আশে পাশে ছোট্ট একটি ঘুঘু-পাখী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল জয়রামের পায়ের শব্দ পাইয়া উড়িয়া মন্দিরের চূড়ায় গিয়া বসিল।

—ক্রমশ

বহুরূপী

শ্রীসুকুমার সরকার

আমি কাব্যের কল্পলতায়
ফুল হয়ে ফুটে উঠি,
সারা বিশ্বের যা কিছু মধুর
মধু হয়ে মোরে করে ভরপুর
পিয়াসী যাহারা তাদেরি মনের
গোপন চুমুতে লুটি।
আমি নিশীথের তৃষিত নয়নে
তারকার দীপালিকা ;
নির্ব্বাণহীনা আপনারে রাখি,
অচেনার পানে চেয়ে চেয়ে থাকি,
যত চাই তত জ্বলে' ওঠে মোর
বাসনা-বহ্নিশিখা !

আমি সরসীর শান্ত সলিল
যবে কিছু বেলা থাকে ;
পল্লীবধূর পেলব পরশে
ফুল-তরঙ্গে ফুটি গো হরষে,
লুকানো তনুরে প্রকাশ করিতে
চাহি আধভেজা কাঁখে !
আমি সে উষার বুক-জোড়া ধন
আকাশে রশ্মিরাশি ;
ষোড়শী কমলকলিকা আমারে
দল-আঁখি মেলে চাহে বারে বারে
বাতায়ন মোরে ডাকে নেহারিতে
শিশুর প্রভাতী হাসি।

আমি শ্রাবণীর মেঘের অলকে
বাঁকা বিদ্যুৎ-সিঁথি ;
আমারে নেহারি অভিসারিকারা
আঁধারে হয় না কভু পথহারা,
কুলভয়ভীরু দুরু দুরু বুকে
চলে ঘন বনবীথি !
আমি শিউলির আপনারে ঢেলে-
দেওয়া শরতের পায়,
নিজ মনে নিজে ঝরে' ঝরে' পড়ে,
দেবতারে মোর বুকে রাখি ধরে',
পরশানন্দে বিবশ এ দেহ
ক্রমে ধূলি হয়ে যায় !
কাজল-কালির প্রেমলিপি আমি
রমণী-নয়ন-নীচে
বুকের যে কথা ফোটে না কো মুখে
আধ-সরমের আধ আধ সুখে
সে সোহাগবাণী গোপনে গোপনে
আমাতে উচ্ছ্বসিছে।
শ্যামল সিথানে বিরহী শিশির
আমি শিশিরাঁখি জল
সে তো ম'রে যায় আমি বেঁচে থাকি
আলোক-বধূঁরে তার হয়ে ডাকি
পরে সে প্রাণেশ পরায় আমারে
মুকুতা-মালিকাদল।
আমি নির্ঝর ঝরি ঝর ঝর
মত্ত বাসনা ধরি',
বারি-বাঁশরীতে গাহি কলগান,
ঢালি উচ্ছ্বাসে সারা মন প্রাণ,

নানা বাধা ভাঙি অসীম সাগরে
মিলনের রাখী গড়ি।
আমি ঘুমন্ত আননকমলে
কুঞ্চিত কেশ-অলি ;
সমীরণ সনে গীত গুঞ্জরি
শিথিল কবরী হ'তে উড়ে পড়ি,
মৃদু অধরের মধু ক'রে পান
পুলকে পড়ি গো ঢলি।

সুনীলাম্বরা সাগর-বধূর
আমি স্বামী বেলাভূমি ;
তাই মেলে শত তরঙ্গাধর
ধেয়ে ধেয়ে আসে মোর মুখ পর
ফেনফুলহারে কণ্ঠ দোলায়ে
মোরে যায় ঘন চুমি।
চন্দ্রের মুখে আমি রোহিণীর
কালো কঙ্কণ দাগ ;
উতল আবেগ প্রথম প্রীতির,
যবে করেছিলো দোঁহারে অধীর,
আমি হয়েছিনু চাঁদের কপোলে
চিহ্নিত অনুরাগ !
পরিণয় রাতে পরিণীতা সাথে
শুভ দরশন আমি ;
মধু বাসরের পুষ্পশয়নে
মুখে মুখ রেখে কুসুমচয়নে
আমারে হানে গো দোঁহে দোঁহাপানে
সলাজে সারাটি যামি।
এ বিশ্ব করে আপনা নিঃস্ব
সাজায় আমার থালা ;

মাধুরী তাহার ফুটিয়া ফুটিয়া
আমারি চরণে পড়ে গো লুটিয়া
মোরি অনুভূতি প্রহরী রেখে গো
ঘুমায় ধরণীবালা।

সকল রূপের সায়র গভীরে
যত আছে রস-বারি—
তারি সিঞ্চনে অঝোর ধারায়
জীবনের ব্যথা চেতনা বাড়ায়,
কান্না ও হাসি বিরহ মিলন
ভরে হৃদি-ফুল-ঝারি।

উপন্যাস

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

(১৯)

বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে। পুষ্পদের বাড়ী এখন আত্মীয়-স্বজন-অতিথিতে পরিপূর্ণ।

দীপক বিদেশে যাইবে, একবার দেখা করিতে আসিল। বিবাহের বোধ হয় আর মাত্র কয়েক দিন তখন বাকী।

বিহারী অনুনয় করিয়া বলিলেন, এ ২'টা দিন থেকে গেলে খুব ভাল হোত দীপক। খুব কি ক্ষতি হবে?

দীপক বিহারী কাকাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, এবং এত তাড়াতাড়ি কেন যাইতে হইতেছে সবই বলা হইল।

বিহারী বলিলেন, তাহ'লে আর আমি তোমাকে জোর করতে চাই না, একজনের মৃত্যুকালের ইচ্ছা!—কিন্তু পুষ্প আর ধীরেনের বড় লাগবে।

দীপক ব্যথিত স্বরে বলিল, আপনি বিশ্বাস করুন বিহারী কাকা, আমার থাকতে খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভয় করছে এখন গিয়েই বা মালীকে দেখ্‌তে পাব কিনা। কাকীমাকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন।

পুষ্পর মা ত দীপক থাকিবে না শুনিয়া একেবারে ধরিয়া বসিলেন, দীপককে থাকিতেই হইবে।

যাহোক্ এক রকম করিয়া মিট্‌মাট্ হইয়া গেল। দীপক সে দিনই রওয়ানা হইবে। বিহারী পুষ্পকে খবর দিয়া পাঠাইলেন দীপক আসিয়াছে।

কিন্তু যে সংবাদ লইয়া গিয়াছিল সে-ই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পুষ্প এখন আসিতে পারিবে না। স্নান করিতে যাইতেছে।

সংবাদটি সকলের কাছেই একটু অস্বাভাবিক মনে হইল।

দীপক শুধু বলিল, আমি না হয় যদি পারি আর একবার আস্‌ব।

দীপক বাহির হইয়া আসিতেই পথে ধীরেনের সঙ্গে দেখা। সে বিহারী বাবুর বাড়ীর দিকেই চলিয়াছে।

দীপককে দেখিয়া ধীরেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ দীপক?

একটা গাছতলার দিকে সরিয়া আসিয়া দীপক খুব শান্তভাবে উত্তর করিল, হ্যাঁ ধীরুদা, বিয়েতে আমার থাকা হোল না।

ধীরু আশ্চর্য্য ও ব্যথিত স্বরে বলিল, তুমি থাক্‌বে না এ বিয়েতে, সে কি করে হয়?

দীপক একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি যে চিরকাল তোমাদের কাছে থাকব না সে কথাটা এখন থেকেই জানা থাকা ভাল। তাহ'লে কষ্ট আমারও হবে না, তোমাদেরও হবে না। পুষ্প বোধ হয় এখন থেকেই তাই অভ্যাস করছে।

ধীরু জিজ্ঞাসা করিল, পুষ্প তোমাকে না দেখে একদিনও থাক্‌তে পারবে এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে বল?

দীপকের মুখে একটা ক্লান্ত হাসি। বলিল, বিশ্বাস আমি কিছুই করতে চাই না। তবে পুষ্প তোমার চাইতে বুদ্ধিমতী বলে' আমাকে তার ভবিষ্যত জীবন থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে এ কথা আমি জানি।

ধীরু তবু জোর করিয়া বলিল, না না, দীপক, তুমি ভয়ানক ভুল করছ। পুষ্প তোমাকে যেমন ভালবাসে এমন আর কাউকে বাসে না এ কথা আমিও জানি।

দীপক আবার মৃদু হাসিল। বলিল, ধীরুদা, হয় ত তোমার কথাও সত্য এবং আমার কথাও সত্য। কিন্তু তার চাইতেও একটা বড় সত্য আছে। অনেক মেয়ে বিবাহের পূর্ব্বে যাকে যতখানি ভালবাসে বিবাহের পরে তাকে ততখানি এড়িয়ে চলে এ কথা বোধ হয় আরও সত্য।

ধীরু দীপককে একটু আঘাত দিবে বলিয়া বলিল, এ কথা তুমি অন্তত পুষ্পর সম্বন্ধে বল্‌তে পার না। পুষ্প তোমারই স্বপ্নরাজ্যের এতকালের সঙ্গিনী।

দীপক মাথা নত করিয়া নীরবে সম্মতি জানাইল। তারপর বলিল, না, তুমি ভুল করছ ধীরুদা। যে ফুলের মালা অভিষেকের দিনে আমার গলায় এসে পড়েছিল, তা একদিন গলিত দুর্গন্ধ হয়ে উঠ্‌বে জেনেই আমি তা গলায় রাখি নি। তুমি সে মালা বাঞ্ছা করেছিলে এবং পেয়েছ। পুষ্প আমাকে এখন কতখানি অবহেলা করতে চেষ্টা করছে তা আমি জানি। এবং তার এই চেষ্টাতে তার হৃদয়ে যে বিষের জ্বালা তা সে-ই একলা ভোগ করছে। সে আমাকে জ্বালাবে বলে নিজে জ্বলে মরছে। তাকে জিজ্ঞেস করো এ কথাটাও সত্য এবং তার কাছে খুব বড় সত্য।

ধীরু বলিল, তাহ'লে তুমি বল্‌তে চাও, পুষ্পকে তুমি আগে থেকেই এ রকম অবিশ্বাস করতে?

দীপক বলিল, ধীরুদা, আবারও তুমি ভুল করলে। সব মেয়েকে যেমন ভাবে বিশ্বাস করে এসেছি পুষ্পকেও ঠিক ততখানি বিশ্বাস করি, হয় ত বা কিছু বেশী। আমার জীবনে যতদিন যাকে বিশ্বাস করেছি, অন্তরের সঙ্গে, নিঃসংশয়ে করেছি। বিশ্বাস করার সম্পর্ক যখন তারা নিজে থেকে কেটে দিয়েছে তখন বিশ্বাস করা না করার কথা আর থাকেই নি।

ধীরু গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, দীপক, আজ যদি তোমাকে অত্যন্ত রূঢ় একটা সত্য কথা বলি তুমি কি আমাকে আর বন্ধু বলে ভাব্‌তে পারবে?

দীপক একটু হাসিয়া বলিল, কি পাগল, তুমি বল যা' তোমার ইচ্ছা। কথাটা শুনে ব্যথা যদিও পাই তার জন্য দায়ী তোমাকে কখনই করব না।

ধীরেন দীপকের হাত দুইটি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া অতি কষ্টে যেন বলিতে লাগিল, দীপক, তুমি হয় ত জান না, পুষ্প তোমাকে কতখানি ভালবাসে। তুমি তাকে অবহেলা করেছ, তার সে একনিষ্ঠ প্রেমের অপমান করেছ। এই বিবাহ তোমার ওপর তার অভিসম্পাত।

দীপক বলিল, তুমি যদি তার বার্ত্তাবহ হও, তাকে বলো, আমি বিনয়াবনত মস্তকে তার এ অভিসম্পাত তুলে নিলাম। কিন্তু এ কথা সত্য, আমি তাকে বিবাহ করি নি বলে তার ভালবাসার আমি অপমান করি নি। অভিমান কত বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ দেখ্‌ছ? আমার প্রতি তার একনিষ্ঠ অনুরাগ থাকলে এবং এ বিবাহে তার অমত থাকলে সে অনায়াসে অসম্মতি জানাতে পারত, আর সে যদি একবার অস্বীকার করত তা হলে কারুর সাধ্য ছিল না তাকে এ বিবাহে সম্মত করে। কিন্তু সে করল ভুল—ঠিক অন্য অনেকের মত। আমার ওপর অভিমান করে, তার নিজের, তার নারী-জীবনের, আমার, তোমার, সকলের প্রতি অন্যায় করলে। এ অন্যায়ের বহ্নি সারা জীবনের অশ্রুর বন্যায়ও নির্ব্বাপিত হবে না।—হয় ত এ কথাও সে জানে।

ধীরু সরলভাবে স্বীকার করিল, আমি আগে এত কথা বুঝতে পারি নি। আমি জানতাম সে তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সে যে তোমাকে এতখানি প্রাণমন দিয়ে ভালবাস্‌ত, তা' আমি একেবারেই জান্‌তাম না দীপক, কিন্তু জেনে অবধি আমার মনের শান্তি হারিয়েছি। আজ তাই তোমাকেই সব চাইতে বেশী অপরাধী করছি।—এ তুমি কি করলে দীপক!

দীপক ধীরে ধীরে ধীরেনের কাঁধের উপর তাহার হাতখানি রাখিয়া বলিল, সত্যি শুন্‌বে ধীরুদা, আমার মনের কথা? ঠিক্ আমাকে যতখানি অপরাধী ভাবছ আমি হয় ত ততখানি অপরাধী নই। বয়স আমার খুব বেশী হয় নি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক রকম ভালবাসা আমি প্রচুর পেয়েছি যা' কখনও অটল রইল না। যখনই যেটুকু পেয়েছি সেটুকুকেই সরল বিশ্বাসে সত্য বলে' শ্রদ্ধা করেছি। আমি নিজে থেকে কখনও কারও অপমান করি নি। কিন্তু আমার ভাগ্যে অন্তত এমন হয়েছে যে, আমাকে ভালবাসাটা তাদের ঐশ্বর্য্যের বিলাসের মতই ছিল, কিন্তু ঘর-গেরস্থালীর জন্য তারা ব্যবস্থা করেছিল অন্য রকম। আমি বলি না তাতে তাদের খুব দোষ হয়েছে। তবে দোষের যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে—আমাকে ভালবাসাটা—না বাসলেই ভাল হোত।

ধীরেন বাধা দিয়া বলিল, নিজের মন বুঝ্‌তে মানুষের দেরী হতে পারে ত?

দীপক বলিল, ঠিক্ কথা। নিজের মন বোঝ্‌বার জন্য সকলেরই অপেক্ষা করা ভাল। আমার অভিজ্ঞতা হয় ত সামান্য কিন্তু ঐটুকুই আমার জীবনের পক্ষে ভীষণ হয়ে উঠেছিল। তাই পুষ্পকে আমি সে অপরাধে আর অপরাধী করতে চাই নি। সে ঐ ভাবে নিজের মন বুঝ্‌তে পারার পূর্ব্বেই তাকে সে অবসর এনে দিয়েছি। হয় ত এইজন্যই তার লেগেছে বেশী।

ধীরেন বলিল, কিন্তু ওর কি উপায় হবে ভেবেছ কি?

দীপক উত্তর করিল, ভেবেছি। আরও অনেকেরই এমন হয়েছে, তাদের যা' উপায় হয়েছে পুষ্পরও তাই হবে। পুষ্প একজন পাকা সুগৃহিনী হবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে তার আজকের মনের কথা ভেবে নিজে নিজে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করবে।

ধীরেন একটু অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিল। দীপকের বড় বড় কথাগুলি তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই। একটু বিরক্তির সুরেই বলিল, কিন্তু তোমার অপরাধই রয়ে গেল।

দীপক কথার সুরে ধীরেনের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, বলিল, অধীর হয়ো না ধীরুদা। আমার আজকের অপরাধ তোমাদের বিবাহিত জীবনের এতটুকু হানি করবে না জেনেই এই অপরাধটি আমি করেছি। আমাকে ক্ষমা কর।—তোমার বাল্যের সেই দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি আজও আমার মনে আছে, কিন্তু কোথায় গেল তা আজ? আমার জীবনেও হয় ত এমন হবে একদিন যে, একখানি হাতের একটি স্নেহের স্পর্শের জন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা হাতড়ে বেড়াতে হবে। এবং সে স্পর্শও হয় ত সেদিন আমি পাব না।

ধীরেনের চোখে জল দেখা দিল। বড় সন্তপ্ত অন্তরে সে দীপকের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, কেন তাহলে নিজে ইচ্ছে করে বান্ধবহীন, সঙ্গীহীন হয়ে চলেছ। পায়ে ঠেলা জিনিষ যে একদিন আবার মাথায় তুলে নেবার ইচ্ছে করলেও তা' পাবে না তা ত জান?

দীপক বলিল, সব জানি ধীরুদা। কিন্তু সহজকে ছেড়ে কঠিনকে গ্রহণ করার মধ্যে যেন আমি আমোদ পাই বেশী। আমার অন্তর উল্লাসে নেচে ওঠে, সমস্ত ধ্যান, চিন্তা, শক্তি নূতন করে' সাড়া দিয়ে ওঠে। আমি নবজন্মের স্বাদ পাই —তাই বারে বারে আমি নবজন্ম পেতে চাই।

ধীরেন বলিল, কিন্তু নবজন্মের সঙ্গে কি পুরাতন সব কিছু ভুলে যেতে পার?

দীপক এবার একটু হাসিল। বলিল, ধীরুদা, তুমি এত হিসেবের কথা শিখ্‌লে কি করে? বেশ, বেশ। ধীরুদা, তোমাকে বলব কি, মানুষ যতদিন সজ্ঞানে থাকে ততদিন কিছুই ভুলতে পারে না—তা' একেবারে অসম্ভব। কিন্তু মোহ যে দিন এল, সেদিন মানুষ নিজেকেই ভুলে বসে।—কাজেই ওসব কথা আর ভাবি না। যা যেমন আছি থাক্। পুরাতনের মধ্যে নিত্য নূতনের স্বাদ যেন পাই এই আশীর্ব্বাদ কর।

ধীরেন যেন একটু চিন্তিত হইয়া হঠাৎ পকেটে হাত দিল। একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিল, কিন্তু যে কথাটা বল্‌তে চেয়েছিলাম এতক্ষণ সেইটেই ভুলে বসে আছি।—বাবা লিখেছেন তিনি আস্‌তে পারবেন না। এও মা'রই পরামর্শ নিশ্চয়।

দীপক বলিল, তিনি তাহলে এলেন না? কি করবে বল, সারা জীবনই ত এ অবহেলা সহ্য করেছ। তবে তোমার কর্ত্তব্য ত তুমি করেছ। কিন্তু—

ধীরেন বলিল, তুমিও থাকবে না দীপক, আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

দীপক খুব অস্পষ্ট স্বরে বলিল, আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম।—আচ্ছা দাঁড়াও। না—তুমি আমার সঙ্গে চল।

ধীরেন বলিল, আমি যে ওঁদের খবরটা দিতে যাচ্ছিলাম।

দীপক তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। বলিল, এ খবর তাঁদের পরে দিলেও চল্‌বে।

বাড়ী আসিয়া দীপক কল্যাণকে বলিল, তুমি আজই রওয়ানা হয়ে যাও। আমি বিয়ে পর্য্যন্ত থেকে সেদিনই রওয়ানা হব। বিশেষ কিছু হলে' টেলিগ্রাম করো।

ধীরেন বলিল, কিন্তু কল্যাণও থেকে গেলে বেশ হোত।

দীপক বলিল, সে আমি জানি না। কল্যাণ যদি থাকা সম্ভব মনে করেন, তাহ'লে আমরা একসঙ্গেই যাব।

কল্যাণ বলিল, তাড়াতাড়ি যাওয়া শুধু দরকার ছিল মালীর সঙ্গে দেখা হবার জন্য। তার যে ব্যারাম, তাতে যে হঠাৎ তার কিছু এদিক-ওদিক হয়ে যাবে এমন ত মনে হয় না। পুরোণ জ্বর-কাশী—বুড়ো কালের।

ধীরেন মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, তবে থেকে যাও—কল্যাণ। উঃ আমার আজ কতখানি সাহস বাড়ল।

ঠিক হইল বিবাহের পরই রওয়ানা হইবে এবং মালীকে আজই খবর পাঠান হইবে।

কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল—দুই পরিবারেই।

আর দুইদিন মাত্র বাকী। ধীরেনের সৎ-মায়ের জন্য ধীরেনের বাবার বিবাহে আসা হইল না। তাই স্থির হইল দীপকের মেজদা অজয়ই বরকর্ত্তা হইবেন। দীপকদের বাড়ী হইতেই বর যাত্রা করিবে। সুষমা, বিমলা, শোভনা নির্ম্মলা প্রভৃতি সকলেই কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। সে-কি উৎসাহ, কি উদ্বেগ! কোথায় কি বাদ পড়িয়া যায়, কোথায় কি ত্রুটি হইয়া যায় এই কথা লইয়াই দীপকদের বাড়ী এখন মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বিহারীবাবুর বাড়ীতে আইবুড়ো ভাতের নিমন্ত্রণ—সুষমারা সকলেই যাইবে। কেবল এ বাড়ীর পুরুষ কয়জন রাত্রে বিহারীবাবুর বাড়ী আহার করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল ধীরেন যাইতে পারিবে না, তাহাকে লইয়াই বিপদ। কাজেই খুব ভোরে উঠিয়া সুষমাই তাহার জন্য রাঁধিয়া বাড়িয়া রাখিয়া দিল।

সমস্ত দিন বিহারীবাবুর বাড়ী হুল্লোড় চলিয়াছে। কোথাও একটু বিষাদের চিহ্ন দেখা দিতে পারে নাই। বিকালের দিকে মেয়েরা সকলে যে যার বাড়ী ফিরে গেল। জন কয়েক নেহাৎ নিকটতর পুরুষ আত্মীয় ও বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা আহার করিতে আসিলেন। দীপকও সকলের সঙ্গে গিয়া একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই একটি ছোট মেয়ে আসিয়া দীপককে বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। মেয়েটি এ-ঘর ও-ঘর পার হইয়া চলিয়াছে। একেবারে পুষ্পর ঘরের কাছে আনিয়া মেয়েটি দীপককে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দীপকের যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। পুষ্প ঘরের ভিতর হইতে ডাকিল, ভিতরে আসুন।

দীপক ঢুকিয়া দেখিল, শ্রান্ত ক্লান্ত নববস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা পুষ্প তাহার খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। দীপককে বসিতে বলিবারও যেন তাহার শক্তি নাই।

দীপক নিজেই একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, তারপর খবর কি? তুমিই কি আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে?

পুষ্প শুধু একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া যাইতেও কোনও কথা নাই দেখিয়া দীপক জিজ্ঞাসা করিল, কিছু বল্‌বে আমাকে?

পুষ্প এবার যেন অতি কষ্টে বলিল, দুই একটা কথা বল্‌ব বলেই ডেকেছি।

দীপক অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু পুষ্প আর কিছু বলে না।

অনেকক্ষণ এ ভাবে বসিয়া থাকিয়া দীপকের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। সে তাই খুব ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখন কিছু বল্‌বে?

পুষ্প একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথা উঁচু করিয়া দীপকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। আস্তে আস্তে চোখ দুইটা তাহার লাল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, তুমি আর একটু কাছে সরে এস।

এই প্রথম বোধ হয় পুষ্প দীপককে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিল।

দীপক কাছে আসিলে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে পুষ্প বলিতে লাগিল, তুমি মহৎ, তুমি উদার; কিন্তু তুমি বড় অহঙ্কারী।—পৃথিবীতে আমার জন্য আর কি কোনও শাস্তি খুঁজে পেলে না?

দীপক নীরব।

পুষ্প আবার বলিল, জান না কি তোমার বন্ধুর এবং আমার কি দশা হোল? শুধু তোমার আত্মাভিমান, তোমার নিজের সম্বন্ধে একটা দারুণ অহঙ্কার আজ এতবড় একটা ঘটনার সূচনা করল।—তুমি পৃথিবীর লোকের হিত করে' বেড়াচ্ছ, আর তোমারই চোখের সামনে, তোমার পাশে আমি কি দুঃখ পেলাম তার খবর জেনেও জানলে না?—তোমার কোনও কাজ সফল হবে ভেবেছ, তোমার কোনও আশা কি পূর্ণ হবে মনে করেছ? দীপক, তা হয় না। কারুকে এক ফোঁটা দুঃখ দিয়ে মানুষের রেহাই নেই।

দীপক স্থির হইয়া বসিয়াছিল। কোনও উত্তর দিতে চেষ্টা করিল না।

পুষ্প এবার কাঁদিয়া ফেলিল, বলিতে লাগিল, কিন্তু এত কষ্টেও আমি তোমাকে অভিশাপ দিতে পারছি না এইটেই আমাকে যেন আরও পাগল করে তুলছে। দীপক, কাজ বড়, না প্রেম বড়? আজ তুমি একটা সত্য কথা বল।

দীপকের সমস্ত হৃদয় হইতে যেন উষ্ণ রক্তবিন্দু ক্ষরিয়া পড়িতেছিল। তবু ধীর স্থিরভাবে বলিল, প্রেম বড়—প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

পুষ্প তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তবে?—নিজের মনেই যেন বলিতে লাগিল, তবে, তবে, তবে!

দীপক এবার যেন সত্যই তাহার মনের কথা বলিতে চেষ্টা করিল, বলিতে লাগিল, পুষ্প, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নি। আর তুমি কখনও প্রকাশ করে আমাকে বল নি যে—

পুষ্প হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বোল না, বোল না ও কথা।

তারপর যেন একটু সম্বৃত হইয়া বলিল, আর কেমন করে প্রকাশ করব? একটা দৃষ্টি কি মানুষের সমস্ত হৃদয়কে চিরকালের মত প্রকাশ করে দেয় না? তুমি কি সত্য করে' বল্‌তে পার আজ, তুমি কিছুই জান নি, বোঝ নি?—কিন্তু সে যাক্‌, আমি ত তোমার কাছে কিছুই চাই নি, শুধু চেয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে থেকে তোমার আদেশ পালন করে যাব। এর চাইতে বড় ধর্ম্মের কথা আমার মনে আর কিছু জানি না।

দীপক বলিল, একেবারে কিছু বুঝি নি তা বল্‌তে পারি না। তবে সত্য কথা যদি বল্‌তে হয় তবে বল্‌ব, আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারি নি তুমি চিরকাল তোমার মনের আদর্শ ঠিক্‌ রাখতে পারবে; আর আজও তা করি না।

পুষ্প অস্থিরভাবে বলিল, এখনও না?

না পুষ্প, এখনও না।

তবে তোমার কোনও ভুল হয়েছে বলে আজও তুমি মনে কর না?

না, করি না।

পুষ্প বলিয়া উঠিল, তুমি কি মানুষ?

দীপক উত্তর করিল, তা' আমি জানি না। তবে আমি যে সত্য কথা বল্‌ছি তা' আমি জানি। আমার অহঙ্কার আছে সত্য এবং তা' যে অনেক সময় আমাকে বাঞ্ছিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে তাও' আমি অনেকবার টের পেয়েছি—তবু কি জানি কেন আমার অহঙ্কার আজও আমার চৈতন্যকে লুপ্ত করে দিতে পারে নি। তাই আজ সত্য করেই বলছি, তোমার কষ্টের কথা ভেবে আমারও ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে, এবং ইচ্ছে করছে যেমন করে পারি, আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েও তোমার মনে শান্তি দি কিন্তু সে পথ আর রাখি নি। সবশেষ তাই বল্‌ছি, আমাকে ঘৃণা কর,

আমাকে অভিশাপ দাও, আমাকে মার্জ্জনা কর—যাতে তুমি শান্তি পাও তাই কর।

পুষ্প বলিল, এত দয়া আর চাই না তোমার। কিন্তু একটা কথা শুধু জান্‌তে চাই, এ আমার কৌতূহল।—তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাস্‌তে বা বাস ?

দীপক উঠিয়া দাঁড়াইল। কাছে গিয়া পুষ্পর মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, বাস্‌তাম, আজও বাসি।

তারপর নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটা ক্ষীণ করুণ কান্নার শব্দ তাহার পিছনে পিছনে যেন আসিতে লাগিল। দীপক কোনও মতে চক্ষু দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া আবার গিয়া সকলের সঙ্গে বসিল। চোখের পাতা তখনও ভিজা ছিল। কল্যাণ কাছে আসিয়া শুধু তাহার কানে কানে বলিল, একটু বাইরে ঘুরে এসো মামা।

কাছাকাছিই বাড়ী। সকলের আহার শেষে দীপক বাড়ী ফিরিল। ঘুরিতে ঘুরিতে একটু পরে বাড়ীর দিকেই গেল। ভিতরে ঢুকিয়া দেখে ধীরেন, অজয়দাদা ও বাড়ীর মেয়েরা বসিয়া খুব গুলতান্ করিতেছে। হাসির উচ্চ রোল বাহির হইতে শোনা যায়।

দীপক যাইতে যাইতে শুনিল অজয় বলিতেছে, আমি ত বরকর্ত্তা, আমাদের বরযাত্রী যাবে ধীরেনদের পোড়াবস্তীর সবলোকেরা। আমাদের সবাইকে চাঁদা করে তাদের নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

শোভনা বলিয়া উঠিল, কিন্তু বেহারীকাকার ওপর তাহলে বড় জুলুম করা হবে।

অজয় বলিল, সে আমি বেহারীকাকার সঙ্গে ঠিক করে এসেছি। তাঁর ত পয়সার অভাব নেই! তার ওপর ঐ একটি মাত্র মেয়ে। খরচ করবেন না কেন? আলবৎ করবেন।

অজয়ের যুক্তিতে আর কেহ বড় বাধা দিল না। বরং সুষমা বলিল, তাদের সব গাড়ী করে নিয়ে যেতে হবে। আমি তার দরুণ পঞ্চাশ টাকা দেব।—সত্যি ওরা কেবল উৎসবের পর এঁটো পাতই কুড়িয়ে খায়—কোনও উৎসবে ওরা মানুষের মত যোগ দিতে পায় না।

সুষমার আগ্রহ দেখিয়া অজয় দশ, ধীরেন পাঁচ এমনি এক দুই তিন করিয়া প্রায় সত্তর টাকার মত চাঁদা উঠিল।

কে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে? স্থির হইল পরের দিন সকাল বেলা অজয়, সুষমা পোড়াবস্তীতে যাইবে, প্রসাদও সঙ্গে যাইবে।

দীপক সব কথাই তাহার ঘরে বসিয়া শুনিয়া গেল। সভা ভঙ্গ হইলে ধীরেন ও কল্যাণ তাহার ঘরে আসিয়া তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া একটু যেন আশ্চর্য্য হইল।

রাত্রি তখন প্রায় মধ্য ভাগে। চাঁদ মাথার উপর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া চলিয়াছে। পাত্‌লা মেঘগুলি চাঁদের গা ঘেঁষিয়া যেন তীরের গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ঘরের পাশের হেনা গাছের ঝাড়টা বাতাসের দাপটে লুটাপুটি করিতেছে। থোকা থোকা ফুলের গন্ধ বাতাসের ঘায়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উর্দ্ধপানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ শোনা গেল বাহির হইতে বেহারীকাকা ডাকিতেছেন।

ধীরেন ও কল্যাণ ত্রস্তে বাহির পানে চলিয়া গেল। দীপক আর উঠিল না।

বিহারী ভিতরে আসিলেন। এটুকু আসিতেই ঝড়ের বাতাসে তাঁহার চুলগুলি এলোমেলো করিয়া দিয়াছে।

বিহারী একটা চৌকিতে বসিয়া দীপকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমার লজ্জা-টজ্জা সব ঘুচে গেছে। দীপক, তুমি একটা ব্যবস্থা না করলে আর রক্ষে নাই।

অন্য দুইজন তাঁহার কথায় অবাক্ হইয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল দীপক বুঝিল আগুন কোথায় লাগিয়াছে। তাই সে নিজ হইতেই বলিল, বিহারীকাকা, সব দোষ আমার। আর আমার এ অপরাধের শাস্তি আমি এখন থেকেই ভোগ করছি। কিন্তু আশা করি শুনলে দুঃখ পাবেন না—আমি আর এর মধ্যে গিয়ে কোনই লাভ হবে না। আমি চিরকালই ঝড়ো বাতাসের মত। আগুন বাড়ানো ছাড়া নেবাতে কখনও পারি নি।

বিহারী চুপি চুপি বলিলেন, কিন্তু ও যে একেবারে বেঁকে বসেছে! আমি ত আর কোনও উপায় দেখ্‌ছি না। তুমি যদি ওকে বল ও নিশ্চয়ই রাজী হবে।

দীপক অসহায়ের মত একবার একটু মৃদু হাসিল। তারপর খুব জোরের সঙ্গেই বলিল, আমি কোনও দিন ওকে এ বিবাহ করতেও বলি নি, আর আজ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে অন্য কোনও অনুরোধও করতে পারব না।

বিহারী হতাশস্বরে বলিলেন, তাহলে এখন উপায়! আজ সবাই ওকে কত বড় অপরাধে অপরাধী করবে ভাব দেখি!

ধীরেন এইবার আন্দাজে যেন অনেকখানি কথা বুঝিল। দীপক কথা বলিবার পূর্ব্বেই ধীরেন বলিল, তিনি এমন কোনও গুরুতর অপরাধ করেন নি যার জন্য সবাই তাঁকে অপরাধী করতে পারে। আমি বল্‌ছি, তিনি যদি বিবাহ করতেন, তাহলেই অপরাধ করতেন।—তাঁকে বল্‌বেন, আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁকে তাঁর বাক্য থেকে মুক্তি দিচ্ছি। তিনি যা' ইচ্ছা করবেন, আর কেহ না থাকে, আমি তাঁর সঙ্গে থেকে সাহায্য করব।

কল্যাণের মনে হইল, এ যেন একটা অভিনয় চলিয়াছে। প্রথম হইতেই যেন নাটকের মত কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ ঘটনা ঘটিয়া বসিবে তাহার যেন কিছু ঠিক নাই।

ধীরেনের কথার পর সে যখন স্পষ্ট বুঝিল, পুষ্পর বিবাহে অমত লইয়াই হঠাৎ এই গোলটা বাধিয়াছে তখন সে বলিল, দাদামশাই, আমি একটা কথা বল্‌তে চাই। আমরা নিজেরা জানি পুষ্প পবিত্র, নিরপরাধ। তার পরেও যদি সবাই তাকে এ বিবাহ ভঙ্গের জন্য অপরাধী করে, আমাদের তাহলে আলাদা হয়ে থাকতে হবে। এর বাড়া আর আমাদের কি করবার ক্ষমতা আছে?

বিহারী বলিলেন, তোমরা সন্তানের বাপ্ হও নি, তার দায়িত্ব, তার ভাবনা তোমরা বুঝ্‌তে পারবে না।

কল্যাণ বলিল, তা স্বীকার করেও আমি বলি, আপনি পুষ্পকে শুধু আপনার সন্তান বলেই ভাব্‌ছেন কেন? সে এই মানব-সমাজের একজন নারী। অন্যের সন্তান হলেও আপনাকে একই রকম করেই ভাবতে হোত। সে মানুষ—এই তার বড় পরিচয়; আর আপনি তার পিতা এবং মানুষ এই তার সব চাইতে বড় আশা।

বিহারী চুপ করিয়া রহিলেন। ধীরেন অগ্রসর হইয়া বলিল, আমি অনুভব করতে পারছি আপনার মত তেজী লোকেরও কোথায় বাধছে। তাই বল্‌ছি সব অপরাধ আমার, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত নই।

বিহারী চিন্তিত ভাবে বলিলেন, কিন্তু এর পর ওর কি হবে? ওকে যে সকলে—

এতক্ষণ পরে দীপক বাধা দিয়া বলিল, ওর মত মেয়েকে কেউ কিছু বলে এমন সাধ্য কারুর নাই। যে বলবে তার শাস্তি আমার হাতে।

বিহারী সংশয় লইয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

সকলে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। দীপক ধীরে ধীরে উঠিয়া ধীরেনের কাছে গিয়া বলিল, ধীরুদা, তুমি এত বড়! তোমাকে নমস্কার করি।

—ক্রমশ

শেলী*

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নির্ঝরিণী উপলবিক্ষতা

১

১৮০৯ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ একজন ডাক্তার কীটকে ইটনের বিখ্যাত স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত করেন।

ইটন স্কুল ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিখ্যাত; ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ নেতারা এই স্কুলের কারখানায় তৈয়ারী হয়।

ডাক্তার কীট ছিলেন একজন পাকা রকমের হেড-মাষ্টার। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বেতের আগায় যে-কোনও ছেলেকে জীবনের যে-কোনও পথে আগাইয়া দেওয়া যায়। তাই তিনি সদা সর্ব্বদা বলিতেন, 'জীবনকে সর্ব্বদাই পবিত্র রাখবে—এই বাইবেল সম্মুখে তোমাদের—নতুবা পশ্চাতে এই দণ্ড—'

ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ নেতারা পশ্চাতে দণ্ড অপেক্ষা সম্মুখে বাইবেলকেই মানিয়া লইত। তখন সবে মাত্র ইংলণ্ডের ওপারে ফরাসীর রঙ্গমঞ্চে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার অভিনয়ের যবনিকা পড়িয়াছে। ইংলণ্ড সেদিন প্রাণপণে ফরাসী স্বাধীনতার আওতাকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাই যৌবনকে কড়া শাসনে রাখিবার ব্যবস্থা সরকার হইতেই অনুমোদন পাইত। ছাত্রের পিতারাও কড়া শাসনে খুসী হইতেন। বিদ্রোহ যদি দমন করিতে হয়—উন্মুখ কৈশোরই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

এই দমন-নীতিটা ইটন স্কুলে সংক্রামক ব্যাধির মত শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্রদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। স্কুলের 'চাঁই'দের প্রত্যেকের একটী করিয়া অনুগৃহীত ছেলে থাকিত। তাহাদের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলি একেবারে দাস্যভাব পরিগ্রহণ করিয়াছিল।

এই সমস্ত অনুগৃহীতেরা তাঁহাদের প্রভুদের জন্য বিছানা তৈয়ারী করিত, খাবার আনিয়া দিত, এমন কি জুতা পরিষ্কার করিয়া দিত! কেহ অন্যথাচরণ করিলে কঠোর শাস্তি ঘটিত—রীতিমত দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। এই সমস্ত প্রক্রিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতেন এবং অনুমোদন করিতেন।

সেখানে আত্মরক্ষাকে ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করা হইত। একবার দুই ছাত্রতে মারামারির ফলে একটী ছেলে একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হেডমাষ্টার কীট খবর শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন ছেলেটীর দেহে জীবনের আর কোনও চিহ্ন নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'এই আকস্মিক ঘটনায় আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে এ-কথাও আমি মানি।' অন্য ছেলেটীর কোনও শাস্তি হয় নাই, কারণ সে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল মাত্র অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

নূতন নূতন যে সব ছেলে স্কুলে ভর্ত্তি হইত তাহাদেরই এই অনুগৃহীতের সৌভাগ্য ভোগ করিতে হইত। এমনি করিয়া ইটনের জীবন-ধারা চলিয়াছিল।

একদিন এই ছেলে-গড়া কারখানায় একটী সুন্দর কিশোর মূর্ত্তির অবির্ভাব হয়। কিশোর দেবতা! প্রভাতের প্রথম ফুলের মত সুন্দর, স্বচ্ছ, ও স্ব-প্রকাশ!

* André Maurois-এর পদাঙ্ক অনুসরণে

ইটনের ছেলেরা বিস্ময়ে তাহার কান্ত প্রকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু কিশোর চারিদিকের আব-হাওয়া দেখিয়া বিস্মিত হইত। সহপাঠীরা তাহাকে অনুগ্রহ করিতে আসিত—ছেলেটীর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করিয়া উঠিত। ভঙ্গুর, কোমল দেহটী প্রদীপ-শিখার মত নড়িয়া উঠিত। ইটনের শিক্ষক ও ছাত্ররা সকলেই বুঝিল এ কিশোর শুধু সুন্দর নয়—ভয়াবহও বটে!

স্কুলে কোনও ছেলের সহিত সে কথা বলিতে পারিত না। তাহার ঘৃণা বোধ হইত। সে কথা কহিত আকাশের সঙ্গে, সন্ধ্যার প্রথম তারার সঙ্গে, পথের পাশে আধ-ফোটা ফুলের সঙ্গে।

ইটনের ছাত্ররা এই নূতন ছেলেটীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার নাম রাখিল—পাগলা শেলী। যত রকম উপায় উদ্ভাবন করিয়া জীবনকে অশান্তিতে পূর্ণ করা যায়—ইটনের ছাত্ররা নিয়মিত ভাবে শেলীর উপর তাহার প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিশোর-দেবতা স্কুলে বসিয়া ভাবিত, সে যেন একটী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম—তাহাকে অরণ্যের শ্যাম নির্জ্জনতার মাতৃবক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র এক পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে—আর সে প্রাণপণে রুদ্ধ-দ্বারে ডানার ঝাপট দিতেছে!

একদিন ছেলেরা শেলীকে ক্ষেপাইয়া তাড়া করিয়া এক মাঠের শেষে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। গলিত স্বর্ণের মত সন্ধ্যার শান্ত নদী বহিয়া চলিয়াছে। কিশোর সাশ্রুনেত্রে করজোড়ে উর্দ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া প্রান্তরের পূর্ণ নির্জ্জনতাকে সাক্ষী রাখিয়া শপথ করিল—হে সুন্দর, এই জীবন তোমাকে উৎসর্গ করিলাম। তোমার পবিত্র মন্দিরের পথে যারা কণ্টক-তরু রোপণ করে—আমি তাহাদের চিরশত্রু। শক্তির দাসত্বের উপর তোমার অভিশাপ পড়ুক—ক্ষমতার ব্যভি-চারের উপর তোমার দণ্ড উদ্যত হউক।

সেই শপথ শুনিবার জন্য আকাশে শুধু একটী তারা উঠিয়াছিল।

২

ছুটীর সময় বাড়ী আসিয়া শেলী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। শিকল ছিঁড়িয়া বনের পাখী যেন আবার বনে ফিরিয়া আসিল।

বাড়ীতে ছিল কিশোরের কল্পনার স্বর্গভূমি। সেখানে কোনও দেবতা বিচরণ করিত না। সেখানে থাকিত শুধু তিনটী কিশোরী মূর্ত্তি আর তাহাদের একক অনুচর শেলী, আর সেই স্বর্গে কেহ ছিল না। সমস্ত বাস্তব জগৎ তাহার নিরুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া যাইত। সেই স্বর্গে একক দেবতার মত শেলী আপনার মনে আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিত—যেন সেই আদি স্রষ্টা।

আত্মার পরমাত্মীয়াদের লইয়া শেলী সেই সৃষ্টির আনন্দ-লোকে বিচরণ করিত। বাড়ীর চারিপাশের বিরাট বাগানে অপ্সরীরা ফুলের পাপড়ির উপর পা ফেলিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইত। মর্ত্ত্যের দেবীরাও সেই নৃত্যে যোগদান করিত আর বিমুগ্ধ দেবতা সৃষ্টির আদিম রহস্য চক্ষু ভরিয়া পান করিত।

মাঝে মাঝে দেবতাটীর খেয়ালের সৃষ্টিতে কিশোরীদের মন আতঙ্কে ভরিয়া উঠিত। বাগানের পুষ্করিণীতে এক বিরাট জলদৈত্য বাস করিত। শেলী নিত্য তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে। দৈত্যটীর বয়স যে কত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সে-ই প্রথম এই পৃথিবীর নন্দন কাননে আদিম নর-নারীকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছে। বাগানের বিরাট শাল গাছটী ঝড়ে যখন দুলিয়া উঠিত—তখন শেলী স্পষ্ট একদিন পাতালের রাজাকে সেখানে দেখিতে পাইয়াছিল। সহচরীদের দেখাইবার জন্য তাড়াতাড়ি সেই ঝড়ে বাগানে তাহারা বাহির হইয়া পড়ে; এবং পরম বিস্ময়ের কথা যে, তাহারা সকলেই দেখিল এক বিরাট পুরুষ ঝড়ের সঙ্গে দুলিতেছে—ধোঁয়ার মত তাহার রঙ্, চোখে তাহার বিদ্যুতের দীপ্তি! কিশোরীরা ভয়ে দেবতাকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

হ্যারিয়েট ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কে?'

শেলী উত্তর দিল, 'ঝড়ের দেবতা। পাতালে তাহার সিংহাসন। মাঝে মাঝে যখন আমাদের পৃথিবীতে আসেন

তখনই এই তুমুল শব্দ ওঠে, সারা প্রকৃতি দোলে, আমরা বলি ঝড় উঠেছে।'

সমস্ত বুঝিতে পারিয়া তাহারা ঘরে ফিরিত। ঘুমাইয়া রাত্রে তাহারা স্বপ্ন দেখিত—সমস্ত পৃথিবী কালো হইয়া গিয়াছে,—কে যেন তাহার গোড়া ধরিয়া নাড়া দিতেছে!

শেলীর কল্পনার নন্দন-লোকবাসিনী কিশোরী তিনটী তাঁহার ভগিনী। দুইজন সহোদরা—আর একজন পিতৃব্য-তনয়া। এই তিনজনের মধ্যে শেলী তাঁহার পিতৃব্য-তনয়া হ্যারিয়েট ও সহোদরা এলিজাবেথকে আত্মার পরমাত্মীয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। একই তারার আলোয় এই তিনটী প্রাণীর জীবন বাড়িয়া চলিয়াছিল। একই গডউইন (Godwin) তাহাদের শিখাইয়া ছিল যে, এই বাস্তব পৃথিবী অসত্যে আর মিথ্যায় ভরা। সমাজ মানুষকে শত নিয়মের নাগপাশে শুধু দাস করিয়া রাখিয়াছে। বিবাহ শুধু সংস্কার। আত্মার মিলনই জীবনের কাম্য।

অন্তত এই দর্শনবাদ কিশোর দার্শনিকটী মুগ্ধ শ্রোতাদের শ্রবণে নিত্য ঢালিয়া দিত।

'তারা চায় নিয়ম দিয়ে মানুষের অন্তরের সহজ স্রোতকে বাঁধতে। পাগল আর কি! সুন্দরের ছায়া যখন চোখে এসে পড়ে—হৃদয়ে তখন সহস্র-শিখা তো জ্বলে উঠবেই! ভালবাসা বা না বাসা কি মানুষের ক্ষমতার মধ্যে? প্রেমের জন্ম চিরমুক্তির কোলে—নিয়মের কারাগার তার শ্মশান-ভূমি। বিবাহ সেই নিয়মের কারাগার ...'

কিশোরীরা একবার সহসা চারিদিকে ফিরিয়া চাহিল। হ্যারিয়েট বলিল, 'আচ্ছা যদি নিয়মের বাঁধনগুলি তত দৃঢ় না হয়?'

দার্শনিক উত্তর দিল, 'যদি দৃঢ় না হয়—তবে তার প্রয়োজন কি? কাগজের প্রাচীর দিয়ে কারাগার রচনা তো বিড়ম্বনা।'

'কিন্তু ধর্ম্ম ... ?'

'জীবনে নিষ্প্রয়োজন! ঈশ্বর থাকায় বা না থাকায় আমাদের মর্ত্ত্য-জীবনের কোনও ধারার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না।'

'সামাজিক আচার ... ?'

'অনন্তকালের চির-প্রবাহের কাছে—ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ক্ষণিকের আচার আর অনুষ্ঠানের মূল্য কতটুকু?'

শেলী আর হ্যারিয়েটের এই তর্কের অন্তরালে কখন আর দুইটী প্রাণী উঠিয়া গিয়াছিল—তাহা তাহারা লক্ষ্য করে নাই।

ম্লান অপরাহ্নের মেদুর আকাশকে ছাইয়া তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার আবরণে কিশোরীর প্রথম প্রেম-উন্মেষের মত ফুল ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহার মধ্যে দুইটী কিশোর মূর্ত্তি নিবিড় সান্নিধ্যে তন্ময় হইয়া চলিয়াছে—পৃথিবীর শৈশব-লোকে আদিম নর ও নারীর মত।

—ক্রমশ

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার কল্লোল-এ 'তোমারি ঝরণা তলার নির্জ্জনে—' শীর্ষক কবিতাটির তৃতীয় লাইনে—

'কোন্ সুদূরে একাকী' স্থলে 'কোন্ দূর—সুদূরে একাকী' হইবে।

কবি শশাঙ্কমোহন শীর্ষক প্রবন্ধে ১৫৩ পৃষ্ঠার শেষদিকে চট্টগ্রামের তিনটি কবির নামোল্লেখ স্থলে বীরেন্দ্রকুমার স্থলে স্বর্গগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বহুদিন হইতে স্থাপিত হইলেও ইহার অস্তিত্ব বা কর্ম্মপ্রণালী দেশের খুব কম লোকই জ্ঞাত আছেন। বাঙলার বিভিন্ন প্রদেশেও সাহিত্য পরিষদ আছে। বৎসরে বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে ইহার প্রাদেশিক অধিবেশন হইয়া থাকে।

যে প্রদেশে সাহিত্য-পরিষদের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়, সেই সভায় প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা, কাহিনী, স্থান, পুকুর, মন্দির, গড় প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস, গান, লোক-সঙ্গীত, প্রাচীন ও নূতন সাহিত্য ও লোকবিবরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছু কিছু হইয়াও থাকে। এই কার্য্য আরও সুসম্পন্ন করিতে হইলে, কেবল মাত্র সম্বৎসরে একবার উৎসবের সময় নয়, বৎসর ভরিয়া প্রত্যেক দেশের প্রাচীন পুঁথি, গাথা, ঐতিহাসিক সামগ্রী ও মৌখিক কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। সে সকল যে উপায়ে হউক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ কার্য্য করিতে যে কেবল মাত্র বাহিরের বাধাই প্রতিকূলতা করিয়া থাকে তাহা নহে। আমাদের জীবনে যুগব্যাপী জড়ত্ব, দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য, দেশের সাহিত্য ও সভ্যতার প্রতি আমাদের অপরিসীম অবহেলা এ কার্য্যে গুরুতর বাধা হইয়া আছে। এ সকল কাজ প্রতিদিন করিবার; অনেক কষ্ট অনেক বিঘ্ন ইহাতে আছে অথচ বাহির হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রতিদিন সম্ভাষণ বা পুরস্কার পাওয়া যায় না। ইহাও এই কার্য্যে চিত্তাকৃষ্ট হইবার পক্ষে একটি অন্তরায়। কিন্তু আশা হয়, দেশবাসীর চেষ্টায় এ কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। এখনও পরিষদের পক্ষ হইতে এ সকল হইতেছে, কিন্তু আরও অধিক পরিমাণে ও ব্যাপক ভাবে এ কার্য্য আরম্ভ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইদানীং বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানের গান সংগ্রহের জন্য কয়েকজন উৎসাহী ও ত্যাগী যুবক ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের সংগ্রহের মধ্যে কিছু কিছু কথনও সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাঙলা দেশের প্রায় প্রত্যেক দীঘি, হাট, গঞ্জ, প্রাচীন বৃক্ষ, মন্দির, মঠ প্রভৃতির সহিত স্থানীয় কোনও না কোনও কাহিনা জড়িত আছে। এই সকল কাহিনী হইতে উক্ত গ্রাম বা প্রদেশের সমসাময়িক অনেক ঘটনার ইতিহাসের ছায়া পাওয়া যায়। দেশের অবস্থার সহিতই সাহিত্যের রূপ গড়িয়া উঠিবার কথা। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে সে কথা ততটা খাটে না। অনেক বিধি নিষেধ, নিষ্পেষণের ভয় দেশের লোককে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছে। তাহা না হইলে বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারা হয় ত অন্যরূপ হইত। হয় ত অধিক পীড়নে একদিন সত্য সত্যই দেশের অবস্থা বাঙলা সাহিত্যকে অন্য রূপ দিবে এবং সে রূপ অশ্রদ্ধাপরায়ণ পরদেশীয়গণ নিঃসংশয়ে সহ্য করিতে পারিবে না। বাঁধনে না পড়িলে বাঁধন কাটিবার উদ্যম আসে না। নিষ্পেষণের অবিচার তাই আরও বেশী করিয়া চাই, মরণের ভয় কাটিয়া যাইবে; মৃত্যুর দ্বারাও যে বরণীয় মুক্তি মানুষ মাত্রেরই কাম্য তাহার জন্য সকল নিপীড়িত জাতিই তাহার শেষ শক্তি প্রয়োগ করে। সে দিন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে মর্ম্মন্তুদ জ্বালার উপর। সেই অনাগত সাহিত্যই আজ দেশের সব কথা জানিতে চায়। তার শক্তি কোথায় ছিল, তার অক্ষমতা কোথায় ভাল করিয়া জানিয়া লওয়া জাতির প্রত্যেকের পক্ষে আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

এইজন্য বাঙলা দেশের লোকের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার দরকার। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে আপন জিনিষ বলিয়া আদর করিয়া লইবার দিন আসিয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী যাহাতে সাহিত্য-পরিষদের সহিত সহজ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কাজ তাহাতে হইবে। কেবল মাত্র সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ফল বেশী হইবে না। আভ্যন্তরিক সমস্ত ত্রুটি নিজেরা জানিয়া লইয়া তাহার পরিহার ও পরিবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য অনেক সময় প্রয়োজন হয় কিন্তু সে প্রাধান্য যদি সর্ব্ববাদীসম্মত ও সর্ব্বজন অনুমোদিত হয় তাহা হইলেই প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা হইতে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়। কেবলমাত্র নিজেদের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই আশঙ্কায় যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে অপরিসর ও নিষ্ক্রীয় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা শক্তিমান্ হইলেও অপরাধী। এই পরিষদ যাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্তা-কর্ষণ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্যও পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের সচেষ্ট হওয়া উচিত। বাঙালী মাত্রেই ইহাকে আপনার জিনিষ বলিয়া ভাবিতে পারিলে এবং ইহার আভ্যন্তরিক কার্য্য-প্রবাহে প্রত্যেকে নিজেকে সমান অধিকারী মনে করিলে পরিষদের প্রসার ও প্রতিপত্তি যে আরও অধিকতর হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই ভাবে, দেশীয় পণ্য, বাণিজ্য, শিল্প ও দেশজাত অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও তাহার আলোচনা হইবার বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর উদ্যোগী ও সচেতন হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

দেশের প্রতি একটা অকৃত্রিম প্রীতি দেশবাসী মাত্রেরই আছে কিন্তু কোন প্রীতিই গভীর ও ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, যদি তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা ঔপন্যাসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সমগ্র বাঙালী পাঠক-সমাজ হইতে একটি সম্বর্দ্ধনা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই উপলক্ষ্যে আমরা শিবপুর সাহিত্য-সংসদ সভাকে এই অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এই সম্বন্ধে শিবপুর সাহিত্য-সংসদ আমাদের পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন;—প্রতি বৎসর যে শিবপুর সাহিত্য-সংসদ হইতে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসব হইয়া থাকে তাহা ঠিক নহে। কেবল মাত্র গত বৎসরই তাঁহারা এই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৩৩৩ সালের ১লা ফাল্গুন তাঁহারা একটি বিশেষ সভায় শরৎচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সহিত শরৎচন্দ্রের জন্মতিথির কোনও সম্বন্ধ ছিল না। ভবিষ্যতে প্রতি বৎসর বাঙলার কোনও না কোনও স্থানে যাহাতে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে ঐ উৎসবটির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন মাত্র।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমাদের মনে হইতেছে কেবল মাত্র শিবপুর সাহিত্য-সংসদের চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা সভার বৃহৎ আয়োজন সম্ভবপর হইবে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বাঙালীর প্রতিষ্ঠান। যদি তাঁহারা শরৎচন্দ্রের একটি বিশেষ সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন, তাহা হইলে সকল দিক দিয়াই অনুষ্ঠানটি ব্যাপক ও শোভন হয়। কেবল মাত্র কয়েক জন শরৎচন্দ্রের অনুরাগীর দ্বারা উৎসবটির ব্যবস্থা হইলে তাহার অন্য দিক্ দিয়া যত মূল্যই হোক্, সর্ব্ব সাধারণের পক্ষ হইতে যে এই সম্বর্দ্ধনা হইল না ইহাই প্রতিপন্ন হইবে, এবং সে জন্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যগত মূল্যও কম হইবে।

শরৎচন্দ্রের নিজের কাছে এরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যতই কম হউক কিন্তু বাঙালী পাঠক মাত্রই যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে দেশের সর্ব্ব সাধারণকে লইয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিয়াছেন ইহা তাঁহাদের তৃপ্তি ও শ্লাঘার কারণ হইবে।

এই সভা সম্বন্ধে যদি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে বাঙ্গালার সমস্ত পাঠাগার ও সাময়িক পত্রে সংবাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে এই সভার ব্যয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

অবশ্য এই সম্বর্দ্ধনা-সভা শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি দিবসে

করার উদ্দেশ্য একটা উপলক্ষ্য পাওয়া গেল এই বলিয়া, নচেৎ যে কোনও সময়েই এই সম্বর্দ্ধনা হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদ যদি এ কার্য্যে উদ্যোগী হন, আমরা আমাদের যথাসাধ্য নিজ চেষ্টা দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। এবং বাঙলার অধিকাংশ পাঠক ও সাহিত্যসেবী যে এ কার্য্যে সহায় হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

স্বর্গগত গোকুলচন্দ্র নাগ বাঙালা সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি কঠিন পীড়ায় ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার আরব্ধ-কার্য্য 'কল্লোল' পত্র এখনও চলিতেছে। অবশ্য বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে হয় ত গোকুলচন্দ্রের এমন কিছু বহু মূল্যবান দান নাই যাহার জন্য বাঙালী জনসাধারণ হইতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আমরা তাঁহার সঙ্গে কাজ করিয়াছি। ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। খ্যাতির জন্য তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই। ঐরূপ চেষ্টা করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তাঁহার উদার হৃদয়ের স্পর্শ যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে তিনিই জানেন গোকুলচন্দ্র মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন।

আমরা যখন প্রথম কল্লোল পত্র প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি, গোকুলচন্দ্র তাঁহার মধ্যে একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত 'কল্লোল' পত্রের উন্নতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস 'পথিক' পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক 'রূপরেখা' 'মায়া মুকুল' এবং তাঁহার লিখিত ছেলেদের উপন্যাস সচিত্র 'পরীস্থান' বিশেষ সম্ভাষণ পাইয়াছে।

কল্লোল পরিচালনের প্রথম কল্পনায় গোকুলচন্দ্রকে সহায় পাইয়া যেরূপ উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছিলাম তাহারই ফলে 'কল্লোল' প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল। আমাদের কল্পনাপ্রসূত কল্লোলের ত্রুটি বিচ্যুতি অতিক্রম করিয়া গোকুলচন্দ্র ইহার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তখন আমাদের পক্ষে এমন সহায়তা আর কিছুই হইতে পারিত না, যাহা কেবলমাত্র কল্পনার মধ্যে আছে তাহা আর একজনের উপলব্ধির নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, উদ্যোগের প্রথম ব্যাকুলতার মধ্যে এমন বল, এমন আনন্দ আর কিছুই হইতে পারে না। অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং বিঘ্নে কর্ম্মভার যখন অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত, তখন গোকুলচন্দ্রের আশার কথা ও কর্ম্মশীলতা তাহা বহুল পরিমাণে লাঘব করিয়া দিত। অন্যদিকে যাহা টান পড়িত, নিজের মধ্য হইতে তাহা পূরণ করিয়া লইবার শক্তি তাঁহার ছিল, খ্যাতি বা অযথা পাণ্ডিত্যের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনে তাঁহার মন আবদ্ধ থাকিত না। মনের আদর্শের সঙ্গে বাস্তব আয়োজনের প্রভেদ অনেকখানি থাকে। আমাদেরও তাহাই ছিল, আজও আছে। কিন্তু সমগ্র চেষ্টাকে অধৈর্য্য দ্বারা বিকৃত করিয়া না দেখিয়া গোকুলচন্দ্র সমস্তই সহজ ও আশার দৃষ্টিতেই দেখিতেন।

গোকুলচন্দ্রের গুণগ্রাহীবর্গ তাঁহার তিরোধানে আমাদেরই মত একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু হারাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় গোকুলচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার একটি আয়োজন হইল। ইহার বিবরণ কল্লোলের পৃষ্ঠায় অন্যত্র ছাপা হইল। কল্লোল গোকুলচন্দ্রের প্রাণের জিনিষ ছিল। তাই কল্লোলকে অবলম্বন করিয়াই এই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করি, গোকুলচন্দ্রের বন্ধুবর্গ, আত্মীয় ও গুণগ্রাহী পাঠকসমাজ এই স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়া এই অনুষ্ঠানের ও বাঙলা সহিত্যের উন্নতি চেষ্টায় সাহায্য করিবেন।

'প্রবাসী' বহুদিনের প্রাচীন মাসিকপত্র। ইহার সম্পাদক প্রবীণ ও পণ্ডিত। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবাসীতে 'পুস্তক-পরিচয়' উপলক্ষ্যকে একজন গুপ্ত 'সেপাই ঝোরা' নামক একটি গল্প পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে দুইখানি মাসিকপত্রের গল্প সম্বন্ধে অযথা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহা প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। পত্রিকা পরিচালনে যে কতকগুলি শিষ্টাচার মানিয়া চলা হয় এই মন্তব্যটি তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে। কোনও পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া, যথেষ্ট আক্রোশ থাকিলেও কেহ কোনও দিন অকারণে কোনও মাসিকপত্র সম্বন্ধে ক্ষতিজনক কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকারী নহেন। আশা করি এই মন্তব্যটি 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয়ের চোখে পড়িলে তিনি এই রীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য দুঃখিত হইবেন এবং যথাসময়ে পুস্তক-পরিচয়ের ঐ অংশটি প্রত্যাহার করিবেন।

'প্রবাসী' বাঙলার একটি বিশিষ্ট পত্র বলিয়া আজও গণ্য। ইহার পরিচালনে এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে দেশের পক্ষে উহা কুদৃষ্টান্তস্বরূপ হয়।

বৈশাখী পূর্ণিমা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

বৈশাখী পূর্ণিমা এলো, বৈশাখী পূর্ণিমা এলো,
বৈশাখী পূর্ণিমা এলো আজ,
নদীর চঞ্চল জলে, পল্লব-অঞ্চল-তলে
নব-জ্যোৎস্না কাঁপিছে সলাজ।
আজিকে উতলা বায় তনু তরু শিহরায়,
মেলি' দেয় লতার আঙুল,
রজত বসন পরি' নামিয়াছে বিভাবরী
আলুলিত করি' তা'র চুল।
আজিকে উৎসব-রাতি, আজিকে উৎসব-রাতি
আজিকে উৎসব-রাতি হায় রে,
তোমার শয়ন-'পরি সোনার প্রদীপ করি'
দগ্ধ মোরে করো নিরালায় রে।
চন্দ্রে যে-কলঙ্ক ছিলো, তব আঁখি নিরখিলো—
ওগো কঙ্কাবতী,
এই ভয়ে পূর্ণশশী আকাশে রচিছে বসি'
একখানি আলোর মিনতি॥

আমারে ডাকিবে তুমি, আমারে ডাকিবে তুমি,
আমারে ডাকিবে তুমি আজ,
উতলা বাতাসে, সখি, এই কথা কয়েছ কি?
দুরু-দুরু কাঁপে হিয়া-মাঝ!

তরল তন্দ্রায় তব আমি পাশে জেগে র'ব,
দুই হাতে ধরিবে দু'হাত,
তব বাম বাহুখানি রাখি' মোর কণ্ঠে আনি'
মুদিবে মদির আঁখি-পাত।
তুমি না ডাকিলে যদি, তুমি না ডাকিলে যদি,
তুমি না ডাকিলে যদি হায় রে,
তোমার দেহের স্বাদ, আমার দেহের সাধ
ধূলি হ'য়ে ঝরিবে ধূলায় রে।
পূর্ণিমা স্বল্পায়ু বলে' কেহ যদি তা'রে ভোলে,
ওগো কঙ্কাবতী!
তুমি যদি বাসো ভালো পূর্ণিমার শুভ্র আলো,
তোমার, আমার নাই ক্ষতি॥

যদি করো অভিমান, যদি করো অভিমান,
যদি করো অভিমান আজ,
তোমার নয়ন-'পরে সুশীতল স্নেহ-ভরে
স্বপ্ন-সম করিব বিরাজ।
তব বক্ষে রাখি' কান শুনিব উদ্দাম গান
মুহ্যমান তব হৃদয়ের
সমুদ্র-কল্লোল-সম মিলাইবে বক্ষে মম
গীতোচ্ছ্বাস তোমার বক্ষের।
তোমার ও বিম্বাধরে অভিমানী চন্দ্র-করে
যেটুকু ফেলিবে দাগ হায় রে,
বুলায়ে চুম্বন-রাগ মুছি' দিব সেই দাগ
শিশির-শীতল করুণায় রে।

চাহিব মরিয়া যেতে তব বুকে বুক পেতে,
ওগো কঙ্কাবতী,
সুধা সে তোমারে দিব, বিষভাণ্ড আমি নিব
আমার জীবন-সিন্ধু মথি' ॥

বৈশাখী পূর্ণিমা এলো, বৈশাখী পূর্ণিমা এলো,
বৈশাখী পূর্ণিমা এলো আজ,
সারা রাত্রি আছে পড়ে' তোমার প্রতীক্ষা করে',
এই ক্ষণে হ'ল মাত্র সাঁঝ।
যবে রাত্রি হ'বে গাঢ়, তোমার মুখের আরো
মদগন্ধ করিব কামনা,
তোমার মুখের 'পরে কহিব অস্ফুট স্বরে—
'তোমা ছেড়ে আমি বাঁচিব না।'
শুনে' তুমি মৃদু হেসে, ক্ষণ-তরে ভালোবেসে
জড়াইবে বুকে মোরে হায় রে,
তোমার গায়ের গন্ধে প্রাণ মোর মহানন্দে
মূরছি' পড়িবে অসহায় রে।
রূপের মদিরা ঢালো, রূপের প্রদীপ জ্বালো,
ওগো কঙ্কাবতী,
দেহ-ধূপ দগ্ধ করি' বৈশাখী পূর্ণিমা ভরি'
জ্বালি' রেখো পূজার আরতি ॥

"উপন্যাসের ধারা"

আলোচনা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা ক্রমেই সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। এবং এই আলোচনার নামে ব্যাপার একটু গুরুতরই হইতে চলিল। যাহারা স্বভাবদোষে অখ্যাত ও অবজ্ঞাত স্থানসমূহ হইতে কেবলমাত্র আবর্জ্জনা কুড়াইয়া কুরুচি সম্পন্ন লেখাসমূহের আলোচনার নামে মাসে মাসে কদর্য্যতার রক্ষণ, প্রসার ও সংগ্রহে তৎপর তাহাদের অবহেলা করিলেও দেশের উপাধিশোভিত পণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ যখন আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে অজ্ঞতা ও অসংযম প্রকাশ করেন তখন তাহার প্রতিবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিকপত্রের গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী মহাশয় 'উপন্যাসের ধারা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবন্ধটির প্রথম দোষ হইয়াছে উহা সমালোচনা না হইয়া অত্যন্ত অসম-আলোচনা হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে শাস্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় বা উদ্দেশ্য যে কি তাহা পরিষ্কার হয় নাই। তিনি নিজে সুরুচির পক্ষ লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাষা ও বর্ণনপ্রণালীতে কুরুচির যথেষ্ট পরিচয় বর্ত্তমান।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "যে গল্প বা উপন্যাসে চরিত্র কল্পনায় শিক্ষনীয় বিষয় থাকে না, তাহা নিন্দনীয় ও পঠনোপযোগী নহে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে পৌরাণিক কাহিনী লইয়া গল্প বা উপন্যাস লেখা হইত, তাহাতে ধর্ম্মের কাহিনী থাকিত, সমাজ-কলঙ্ক দৃষ্ট হইত না।' ইত্যাদি।

প্রথম কথা—উপন্যাসের চরিত্র-কল্পনায় শিক্ষনীয় বিষয় থাকে না।

কেবলমাত্র শিক্ষনীয় বিষয় শিখাইতে হইবে এরূপ চরিত্র-সৃষ্টি উপন্যাসকারকের কার্য্য নহে। তবে প্রত্যেক উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির ভিতরই একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও গতি নিহিত থাকে, তাহা সমগ্র উপন্যাস পাঠ করিলেই যে-কোনও লোক ধরিতে পারে। কেবলমাত্র তাহাই প্রকাশ করার চেষ্টা বেশী থাকিলে উপন্যাসের রস নষ্ট হয় ও লিখন-প্রণালীতে ব্যাঘাত ঘটে। আর এক কথা, শাস্ত্রী মহাশয় কতগুলি গল্প বা উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। যদি কয়েকখানি পড়িয়া তাঁহার এই মত পরিপুষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার আজকালকার সমস্ত উপন্যাসই পঠনো-পযোগী নহে এ কথা বলিবার কারণ নাই। এমনও হইতে পারে, তিনি যে কয়খানি উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন তাহা সুলিখিত নহে। অথবা সুলিখিত উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংস্কার সমগ্র গ্রন্থের রস গ্রহণে বাধা হইয়াছে। পাণ্ডিত্য কাহারও সর্ব্বতোমুখী থাকে না। পাণ্ডিত্যের অভিমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাণ্ডিত্যকে ছাড়াইয়া যায়। উপন্যাস হইতে রসগ্রহণ করিতে পণ্ডিত রসিক হওয়াও প্রয়োজন।

পূর্ব্বের ন্যায় মানুষের জীবনধারা একভাবে চলিতেছে

না। তাহার অশান্তি যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, সেই কারণে মস্তিষ্কও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই ক্লান্তি অপনোদনের জন্যও অনেকে উপন্যাস গল্প প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকে। এবং সেই সকল গল্পের মধ্যে যদি আবার সমস্যা ও নানা প্রকারের জটিল তর্ক বা তাহার মীমাংসা গ্রথিত থাকে তাহা হইলে ক্লান্ত মস্তিষ্কের পক্ষে ঐ গ্রন্থ আরামদায়ক হয় না। মন এবং শরীরের বিশ্রামের জন্যই উপন্যাসাদি অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন উপন্যাস লোকশিক্ষার যে বিশেষ সাহায্য করে তাহা অন্ধকার দিনে কাহারও স্বীকার করিতে বাধা নাই।

বাঙলা দেশে আজ কাল যত গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে তাহার সকলগুলিই যে অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন এ কথা বলা নির্ব্বুদ্ধিতা। সব গল্প উপন্যাসকে একগোত্রে ফেলিবার কোনও কারণ নাই।

দ্বিতীয় কথা পৌরাণিক কাহিনী উপন্যাসে প্রচার। পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর অনেক অংশ খুব ভাল এবং তাহার প্রচার সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীও সর্ব্ব অংশে সুরুচি সম্পন্ন নয়।

তারপর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, উপন্যাসে 'সমাজ কলঙ্ক দৃষ্ট হইত না।' আজ যদি সত্যই উপন্যাসে সমাজের দুর্ব্বলতা বা কলঙ্ক কেহ আলোচনা করেন তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে অন্য লোকের চোখ খোলে এবং নিজেদের দুর্ব্বলতা ও কলঙ্কের কথা জানিয়া লোকের ইহা হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা হয়।

শাস্ত্রী বলেন, 'লেখকেরা বাজারের রুচি অনুসারে' 'বিকৃত-রুচির জিনিষ লিখিয়া থাকেন।'

শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় পাঠক-সমাজকে বাজার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র বাঙলা দেশে কয়েকজন উপন্যাস লেখক ভিন্ন আর যাঁহারাই উপন্যাস পাঠ করেন তাঁহাদের সকলের রুচিই কি এত বিকৃত? শাস্ত্রী মহাশয় নিজে কি উপন্যাস লেখক? তাহা না হইলে তিনিও ত পাঠক-সমাজের মধ্যেই পরিগণিত হন্।

সকল লেখকই যে বাজারের রুচি অনুসারে লেখেন না তাহার প্রমাণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই প্রবন্ধ। আজকালকার উপন্যাস গল্পগুলি যদি বাজার অর্থাৎ পাঠক-সমাজের রুচি অনুসারে লেখা হইত তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের ক্ষোভের কারণ না থাকিবারই কথা ছিল। তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়াই শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য আজ উপন্যাসের ধারা রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহাই কি ঠিক্ নহে?

তারপরে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'মেয়েদের লেখনী হইতে এমন লেখাও দেখিতে পাই যাহা নিরাপত্তে স্ত্রী-সমাজে ভগিনী, দুহিতাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারা যায় না।' এ বিষয়ে বর্ত্তমান কালের লেখিকারা উত্তর দিলেই ভাল হয়। আমাদের জানা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী হইতে শ্রীমতী সরসীবালা, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী প্রভৃতি কোনও লেখিকার কোনও পুস্তকই কুরুচিপূর্ণ লেখা নয়।

শাস্ত্রী মহাশয় আবার বলিয়াছেন, 'নির্লজ্জ বিলাসী কামুক স্বামীরা এইরূপ গ্রন্থ স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে **গণিকা** সাজাইয়া আমোদ উপভোগ করেন।'

ইংরাজী শিক্ষিতা ভদ্র মহিলার সংখ্যা আজকাল সমাজে সংখ্যায় অল্প নহে। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ করেন বলিয়াই কি গণিকা সাজিয়াছেন?

আর বাঙলা দেশের শিক্ষিত স্বামী মাত্রেই স্ত্রীকে ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতে দেন বলিয়া কামুক ও বিলাসী?

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'মাসিক কাগজগুলি আর একটা জঞ্জাল বিশেষ।' মাসিক কাগজে জঞ্জাল ছাপিলে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত লোকও মাসিক কাগজগুলাকে জঞ্জাল বলিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মাসিক কাগজের পৃষ্ঠায় জঞ্জাল ছাপাইয়া তাহাকেই জঞ্জাল বলা, ইহাতে নূতনত্ব আছে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়েও অনেকেই এরূপ গল্প উপন্যাসের পক্ষপাতী। সেইরূপ তাঁহারা লেখেন, পাঠও করেন। এ বিকৃত রুচির হাঙ্গামাটাকে কেমন করিয়া রহিত করা বা বদলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা লইয়া মাঝে মাঝে যে আলোচনা না হইতেছে এমন নহে; কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও রুচি উভয়ই বিকৃত।'

শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ কথাটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে আর উপায় কি?

'বাস্তব ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া যাঁহারা তুলিকাদ্বারা চরিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ লেখক।'

শাস্ত্রী মহাশয়ের এ মন্তব্য যদি ঠিক হয় তাহা হইলে বোধ হয় আজকালকার গল্প লেখক বা উপন্যাস লেখকদের অপরাধী করিবার কোনই কারণ নাই।

'থিয়েটারগুলি আমাদের সমাজের কম অপকার করিতেছে না। এই সকল থিয়েটারে অশ্লীল চিত্র ও বারাঙ্গনার হাবভাবে অশ্লীলতা দেখিয়া নিতান্ত যোগীপুরুষ ছাড়া, স্কুল কলেজের ছোক্‌রা, ঘরের মেয়েরা কি আত্মসংযম করিয়া থাকিতে পারে?'

উপন্যাসের ধারা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া থিয়েটারের কথা উল্লেখ করিবার কি কারণ ছিল বুঝা গেল না। যাহা হউক শাস্ত্রী মহাশয়ের এ মন্তব্যটি চমৎকার! প্রথমে ধরা যাউক, স্কুল কলেজের ছোকরা এবং ঘরের মেয়েরা ব্যতীত সকলেই যোগীপুরুষ! কিন্তু যোগীপুরুষ না হইয়াও বাঙলার অধিকাংশ স্কুল কলেজের ছোকরা ও বাড়ীর মেয়েরা যে থিয়েটার দেখিয়াও আজও পর্য্যন্ত 'ঠিক্‌' আছেন তাহা শাস্ত্রী মহাশয়কে সংবাদ লইয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

'মেয়েরা থিয়েটার দেখিয়া থিয়েটারী ঢংএ সাজিতে চায়, যুবকেরাও অন্ততঃ মেয়ে মহলে তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করে।'

শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় জানেন, থিয়েটারের নটনটিগণ তাঁহাদের অভিনয়ে ভূমিকা উপযোগী বেশে সজ্জিত হইয়া থাকেন। যে অভিনেত্রী একদিন প্রফুল্ল সাজেন, তাহাকেই সেই রাত্রেই অথবা অন্য অভিনয়ে উদীপুরী বেগম সাজিতে হয়। সত্যই যদি আমাদের মেয়েরা থিয়েটারী ঢং-এ প্রফুল্ল, উদীপুরী, চেরীবৃন্দ, চাঁদ সুলতানা, ষোড়শী বা দুর্গেশনন্দিনী এবং পুরুষরা নারদ, মহাদেব, ভীষ্ম, কর্ণ, রাম, লব, কুশ, কাঙ্গালী ডাক্তার, প্রভৃতি সাজিয়া ঘরে এবং বাহিরে বিচরণ করিতেন তাহা হইলে অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার হইত সন্দেহ নাই।

আজ কাল মেয়েদের কাপড় পরার ধরণ কুরুচি সঙ্গত ইহাই বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বলিবার কথা। ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের কাপড় পরা কি এতই কুরুচিসঙ্গত যে তাহার অনুকরণ করিয়া অন্য কোনও মেয়ে কাপড় পরিলে দোষের হইবে? সাম্‌নে কোঁচা দিয়া কাপড় পরা প্রধানতঃ কোচবিহার, আসাম ও মান্দ্রাজ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে ত কোনও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় না। বরং দেহের সমস্ত অংশই খুব ভাল করিয়া ঢাকা থাকে।

শাস্ত্রী মহাশয় একটা বিশেষ ভুল করিয়াছেন থিয়েটারী ঢং-এ আমাদের অনুকরণ করিতে হয় না। থিয়েটারই সমাজের অবস্থা, রীতি ও তৎকালীন বেশভূষা অনুসারে বিভিন্ন অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন সজ্জার অনুকরণ করিয়া থাকে। থিয়েটারকেই বরং নানাভাবে সমস্ত দেশ, জাতি, ও বিভিন্ন কাল ও সমাজকে বেশভূষায় ও অঙ্গ ভঙ্গীতে অনুকরণ করিতে হয়।

'কাহার অনুকরণ তাঁহারা (লেখকগণ) করেন তাহাও বুঝা যায় না।'

লিখিতে গেলেই যে কোনও বিশেষ ব্যক্তির ভাষার অনুকরণ করিতে হয় এমন কথা জানা নাই। নিজে কেহ স্বাধীনভাবে লিখিলে কি তাঁহার ভাষা ভাষা হয় না? এ কালে যাঁহারা বিশিষ্ট লেখক বলিয়া পরিচিত—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কাহার লেখার অনুকরণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ তাঁহাদের নিজস্ব।

'উপন্যাস ও গল্পের নায়ক নায়িকা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা কলিকাতা বা তদঞ্চলে হওয়া চাই। নায়ক, নায়িকাদের বাড়ী পূর্ব্ব বা উত্তর বাঙ্গালায় হইলে চলিবে না। পদ্মা, তিস্তার কথা, বা ঢাকা কি রাজসাহী সহরের কথা বলিলে তাহা অচল হইবে ইত্যাদি। এ সকল রুচি কোথা হইতে আসিল?'

লেখক মহাশয় বোধ হয় জানেন না, আজকালকার উপন্যাস ও গল্পে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সাঁওতাল পরগণা, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অনেক স্থানের ঘটনা ও ভাষা বহুল পরিমাণে থাকে। এবং কেবলমাত্র ধনীগৃহের কাহিনী নয়, কুলী মজুর, ভিখারী, মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ, কেরাণী-জীবন, কল, কারখানা এমন অনেক বিষয় লইয়াই লেখা হয়।

অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় এ সকল পছন্দ করেন না

এমন কুরুচি যাঁহাদের আসিয়াছে তাঁহারা এ ধরণের গল্পগুলিকে উপহাস করিয়া থাকেন শোনা যায়।

সর্ব্বশেষে নিবেদন, এ কালে যে বিষয়ে যে দোষ ত্রুটি ঘটিতেছে তাহা অল্প বিস্তর সকলেরই জানা আছে। গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাহা অতিক্রম করিয়া গুণেরই আদর করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র দোষ ধরিবার জন্য উৎসুক হইলে পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, কিছু নাই যাহার দোষ ধরা যায় না। মানুষ মানুষ। তাহার অপূর্ণতা অক্ষমতা থাকিবেই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এরূপ আলোচনায় কোনও দোষ হইত না যদি তিনি কতকগুলি অসত্যের অবতারণা করিয়া নিজের দেশের শিল্পী ও বিশেষ করিয়া সামাজিক পুরুষ ও নারীদের এরূপ ভাবে অকুণ্ঠিতচিত্তে অপমান না করিতেন। আরও বেশী জানিয়া শুনিয়া ও সংযমের সহিত তাঁহার প্রবন্ধটি লেখা উচিত ছিল।

অভিভাষণ *

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(১)

গত বছর দু'তিন ধরে বাঙলাদেশের সদর মফঃস্বল নানা সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়মিত নিমন্ত্রিত হই। বাঙলাভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ যে আমাকে তাঁদের সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করেন, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ এই সূত্রে প্রমাণ হয় যে, আমার পক্ষে বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চাটা বৃথা কাজ বলে গণ্য হয় নি। ভারতচন্দ্র বলেছেন—'যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে'; বাঙালি-জাতি যে মনে করে যে, লেখা জিনিষটি আমার সাজে, এ কি আমার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অধিকাংশ নিমন্ত্রণই আমি রক্ষা করতে পারি নে। ইংরাজীতে যাকে বলে the spirit is willing but the flesh is weak, আমার বর্ত্তমান অবস্থা হয়েছে তাই। সমস্ত বাঙলা দেশময় ছুটে বেড়াবার মত আমার শরীরে বলও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। যে পরিমাণ শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের মূলধন নিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করি কালক্রমে তার অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে; যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু কৃপণের ধনের মত সামলে ও আগলে রাখতে হয়। তৎসত্ত্বেও শান্তিপুরের নিমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না।

প্রথমতঃ একটি চিরস্মরণীয় লেখক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, এবং সে সব কথা শোনবার অনুকূল শ্রোতার অভাব আমার বিশ্বাস এ নগরীতে হবে না। দ্বিতীয়তঃ আমার নিজের সম্বন্ধেও দুই একটি ব্যক্তিগত কথা বলতেও আমি বাধ্য হব। সমালোচকেরা যখন সাহিত্য-সমালোচনা করতে বসে' কোনও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনা সুরু করেন তখন প্রায়ই তা আক্ষেপের বিষয় হয়, কারণ কোনও লেখকের লেখা থেকে তার জীবন-চরিত উদ্ধার করা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রণোদিত সমালোচকদের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাও

* শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীর একাদশ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।

আমি এ যুগের সাহিত্যিকদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি। যুগ-ধর্ম্মানুসারে একালে সাহিত্য-সমালোচনাও এক রকম বিজ্ঞান। এবং তার জন্য নাকি লোকের ঘরের খবর জানা চাই।

(২)

সম্প্রতি কোনও সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর। এমন কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নিন্দা করা, কি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করা তা ঠিক বোঝা গেল না। যদি আমার নিন্দা হয় ত ভারতচন্দ্র সে নিন্দার ভাগী হতে পারেন না, আর যদি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা হয় ত সে প্রশংসার উত্তরাধিকারী আমি নই। সম্ভবতঃ সমালোচকের মুখে ভারতচন্দ্রের স্তুতি ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ বর্ণচোরা নিন্দা মাত্র। এখন এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যে-জাতীয় নিন্দা প্রশংসার আমরা অধিকারী, ভারতচন্দ্র সে জাতীয় নিন্দা প্রশংসার বহির্ভূত।

ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন অথচ আজও আমরা তাঁর নামও ভুলি নি, তাঁর রচিত কাব্যও ভুলি নি, এমন কি তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছি।

অপর পক্ষে আজ থেকে ১৮০ বৎসর পরে বাঙলার ক'জন সাহিত্যিকের নাম বাঙালীজাতি মনে করে রাখবে? আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এতদ্ব্যতীত আরও দু এক জনের নাম হয় ত আগামী কালের কোনও বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে, বাদবাকী আমরা সব জলবুদ্বুদ, জলে মিশে যাব।

আর একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গত ১৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরাজের রাজ্য, আমাদের কর্ম্ম-জীবন এখন ইংরাজ-রাজের প্রবর্ত্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতে বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ড প্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরি নাম সাহিত্যে অমরতা। আর এ-ক্ষেত্রে সমালোচনার কার্য্যে লৌকিক নিন্দা প্রশংসা নয় এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা। কিন্তু তা করতে হলে মনকে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হয়। কিন্তু দুর্বিনীত সাহিত্যে রাগই পুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য।

(৩)

সকল দেশের সকল সাহিত্যেই এমন দু' একটি সাহিত্যিক থাকেন যাঁরা লোকমতে যুগপৎ বড়লেখক ও দুষ্টলেখক। উদাহরণ স্বরূপ ইতালীদেশের মাকিয়াভেলির নাম করা যেতে পারে। মাকিয়াভেলির Prince সাহিত্য হিসেবে ও রাজ-নৈতিক দর্শন হিসেবে যে ইউরোপীয় সাহিত্যের একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ এ কথা ইউরোপের কোনও মনীষী অস্বীকার করেন না, অথচ মাকিয়াভেলি নামটি গাল হিসেবেই প্রসিদ্ধ।

আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যেও ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতচন্দ্রের এ দুর্নামের মূলে কতটা সত্য আছে, সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার। কারণ কুসংস্কার মাত্রই কালক্রমে সমাজে সুসংস্কার বলে গণ্য হয়। সাহিত্য-সমাজেও অনেক সময়ে উক্ত হিসেবে কু, সু হয়ে ওঠে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমার মিল আছে সে বিষয়ে ঈষৎ লক্ষ্য করলেই ভারতচন্দ্রের যথার্থরূপ ফুটে উঠবে।

প্রথমে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করা যাক্। বলা বাহুল্য তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা নেই। তবে তিনি নিজ মুখেই তাঁর জীবনের দুটি-চারটি মোটা ঘটনা প্রকাশ করেছেন।

আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও আমি, আমরা উভয়েই উচ্চব্রাহ্মণ বংশে উপরন্তু ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ঘটনা যে তাই, ভারতচন্দ্র তা গোপন করতে চেষ্টা করেন নি, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন যে—

ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর, অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

এখন জিজ্ঞাসা করি কোনও লেখকের লেখা বিচার করতে বসে তার কুলের পরিচয় দেবার সার্থকতা কি? বিশেষতঃ সে বিচারের উদ্দেশ্য যখন লেখককে অপদস্থ করা।

যদি পৃথিবীর এমন কোনও নিয়ম থাকত যে, লেখক উচ্চব্রাহ্মণ বংশীয় হলেই তাকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হতে হবে, তাহলে সমালোচক অবশ্য কুলজ্ঞ হতে বাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করাটা ত সাহিত্য-সমাজে লজ্জার বিষয় নয়। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বহু কবি ত জাতিতে ব্রাহ্মণ; এবং তার জন্য তাঁদের ইতিপূর্ব্বে কেউ ত হীনচক্ষে দেখে নি।

শুনতে পাই ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে Non-Brahmin Movement নামক এক ঘোর আন্দোলন চলেছে—কিন্তু সে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে, কিন্তু উত্তরাপথের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও যে ব্রাহ্মণ নিগ্রহের জন্য কোনও দল বদ্ধপরিকর হয়েছে এমন কথা আজও শুনি নি, সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে স্বীকার করছি যে, আমিও সেই সম্প্রদায়ের লোক, যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রী মন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে। এ বংশে জন্ম গ্রহণ করাটা এ যুগে অবশ্য গৌরবের কথা নয়, কিন্তু অগৌরবের কথাও নয়।

সম্ভবতঃ সমালোচকের মতে একে ব্রাহ্মণ, তায় ভূসম্পন্ন হওয়াটা একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধের সংযোগের তুল্য। ভারতচন্দ্র এ জাতীয় সমালোচকের মতে যতটা অবজ্ঞার পাত্র, কবিকঙ্কন বোধ হয় ততটা নন। কারণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যের আরম্ভে এই বলে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন যে—

'দামুন্যায় চাষ চষী।'

কিন্তু চাষ না চষলে যে বড় লেখক হওয়া যায় না সাহিত্য-জগতে তারও কোন প্রমাণ নেই। কারণ ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও এক রকম চাষ আছে আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে সাহিত্য। অন্ততঃ এতদিন ত তাই ছিল।

আমার মনে হয় যে, ভারতচন্দ্রের জাতি ও সম্পত্তির উপর কটাক্ষ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইঙ্গিতে এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করবার ফলেই সাহিত্যচর্চ্চা তাঁর পক্ষে বিলাসের একটি অঙ্গমাত্র ছিল। সুতরাং তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন সে হচ্ছে বিলাসী সমাজের প্রিয়। আজীবন বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হলে লোকে যে সরস্বতীর সেবা করে তাঁর নাম দুষ্ট সরস্বতী। লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলনে যে অনর্থ ঘটায় এমন কথা অপরের মুখে ও অপর কোন কবির সম্বন্ধে শুনেছি। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জীবন কতটা বিলাস বৈভব পূর্ণ ছিল তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

(৪)

সমালোচকরা আবিষ্কার করেছেন যে, আমার জীবন হচ্ছে একটি ট্রাজেডি। এক হিসেবে মানুষ মাত্রেরই জীবন একটা ট্রাজেডি এবং আমি অবশ্য সাধারণ মানব-ধর্ম্মবর্জ্জিত নই। কিন্তু কি কারণে আমার জীবন অনন্যসাধারণ ট্রাজেডি সে কথাটা তাঁরা প্রকাশ করে বলেন নি, বোধ হয় এই কারণে যে, আমার জীবন সুখময় কি দুঃখময় তা অপরের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আর আমার জীবনের যে পরিচয় সকলেই পান তাকে ঠিক ট্রাজেডি বলা চলে না। আমার মাথার উপর চাল আছে আর সে চালে খড় আছে, আমার ঘরে ক্ষুধার চাইতে বেশি অন্নের সংস্থান আছে, উপরন্তু আমার পরিধানের বস্ত্র আছে, ইংরাজী বাঙলা দু রকমেরই। এর বেশী সামাজিক লোকে আর কি চায়? আর যে progress-এর আমরা জাতকে জাত অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়েছি, তারই বা চরম পরিণতি কি? সকলের পেটে ভাত ও পরণে কাপড়ই এ যুগে মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ নয় কি? সম্ভবতঃ আমার গুণগ্রাহী সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে আমার সাংসারিক জীবন নয়, সাহিত্যিক জীবন একটা মস্ত ট্রাজেডি অর্থাৎ আমার সাংসারিক জীবন মহা ট্রাজেডি হলে আমার সাহিত্যিক জীবন এত বড় প্রহসন হত না।

সে যাই হোক, ও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনও মিল নেই। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবন ছিল একটি অসাধারণ ট্রাজেডি। সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করছি, তার থেকেই প্রমাণ পাবেন যে, তাঁর জীবনের তুল্য ট্রাজেডি বাঙলার কোন সাহিত্যিকেরই নয়, এমন কি তাঁদেরও নয় যাঁদের সাহিত্যিক জীবন হচ্ছে একেবারে Divine Comedy.

ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে আমি কোনরূপ গবেষণা করি নি, কারণ এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল যে, ভগবান আমাকে কোন বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি। সুতরাং পরের মুখের কথার উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক ব্যক্তি 'কবির জীবনী সম্বলিত' ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। এই অখ্যাতনামা প্রকাশকের 'প্রস্তাবনা' হতেই আমি ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস, বসু মহাশয়ের দত্ত বিবরণ সত্য। কারণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বলেছেন, শুধু বসু মহাশয়ের বঙ্গাব্দ সেন মহাশয়ের হাতে খৃষ্টাব্দে পরিণত হয়েছে, এই যা তফাৎ।

(৫)

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরসুট পরগণার অধিপতি ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতির সঙ্গে বিবাদে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন্।

ভারতচন্দ্রের বয়স তখন এগার বছর। এই অল্প-বয়সেই তিনি বিদ্যাভ্যাসার্থ লালায়িত হন। পিতার বর্ত্তমান নিঃস্ব অবস্থায় যথারীতি বিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা হওয়ায় তিনি 'পলায়ন পূর্ব্বক' মাতুলালয়ে গমন করেন; এবং তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান অতি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন। উভয় বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে পেঁড়োয় ফিরে আসেন। অতঃপর তাঁর বিবাহ হয়।

অর্থকরী পারস্য ভাষা শিক্ষা না করে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করেন।

তারপর দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদারের মুন্সীর আশ্রয়ে তিনি অতি পরিশ্রমপূর্ব্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দিনে স্বহস্তে একবার মাত্র রন্ধন করে তাই দুবেলা আহার করতেন। অনেক সময়ে বেগুন পোড়া ছাড়া আর কিছু তাঁর কপালে জুটত না। এই সময়ে ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন।

পারস্যভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ করে তিনি বিশ বৎসর বয়সে বাড়ী ফেরেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তখন তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ভারতচন্দ্রকে তাঁদের মোক্তার নিযুক্ত করে বর্দ্ধমানের রাজধানীতে পাঠান। তারপর রাজকর্ম্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে কারারুদ্ধ হন। তারপর কারাধ্যক্ষের কৃপায় জেল থেকে পালিয়ে কটকে মারহাট্টাদের সুবেদার শিবভট্টর আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাস করে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয় পাঠ করেন। ফলে তিনি ভক্তিমান বৈষ্ণব হয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে সদা সর্ব্বদা ধর্ম্ম চিন্তায় কালাতিপাত করতেন। তারপর বৃন্দাবনধাম দর্শন মানসে তিনি শ্রীক্ষেত্র হ'তে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর শ্যালীপতি ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর অনুরোধে ভারতচন্দ্র আবার সংসারী হতে স্বীকৃত হন, এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য ফরাসডাঙ্গায় Dupliex সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র টাকা ধার করবার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁরই অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনেয় নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে খুসি হয়ে ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং সেখানে বাড়ী তৈরী করবার জন্য

এককালীন একশ টাকা দান করেন। এই গ্রামেই তিনি আটচল্লিশ বৎসর বয়েসে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

তাঁর শেষ বয়েসের কটা দিন যে কি ভাবে কেটেছিল তার পরিচয় তাঁর রচিত নাগাষ্টকেও পাওয়া যায়। আমি উক্ত অষ্টকের তিনটি মাত্র চৌপদি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি,—

'গতরাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে
ভবদ্দেশে শেষে সুরপুর বিশেষে কথমপি।
স্থিতঃ মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥
বয়শ্চত্বারিংশৎ সদসী নীতং নৃপময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ॥
কৃতাবাটীঃ গঙ্গাভাজন পরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশাদাসাস্তাশ্চকিতমনসা বান্ধবগণাঃ
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

(৬)

যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে এগার বৎসর বয়সে পরভাগ্যোপজীবী হতে বাধ্য হন, যিনি এগার থেকে বিশ-বৎসর পর্য্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরান্ন-ভোজনে জীবনধারণ ক'রে বিদ্যা অর্জ্জন করেন, তারপর আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তার পরে জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশ ত্যাগ ক'রে কটকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তারপর শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণব শাস্ত্রচর্চ্চা করে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তারপর আবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার প্রথমে Dupliex সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আশ্রয় পান আর তথায় মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে কাব্য-রচনা করেন এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্দ্ধমান রাজার কর্ম্মচারী কর্তৃক নানারকম উৎপীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্ক হয়। আমাদের জীবন অবশ্য আজও হ্রাস বৃদ্ধির নিয়মের অধীন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত অবস্থার বিপর্য্যয় আজ কারও কপালে ঘটে না। ভারতচন্দ্রের জীবন দেশব্যাপী ভূমিকম্প ও ঝড় জলের ভিতর কেটে গেছে। সেকালের দেশের অবস্থা যদি কেউ জানতে চান তা হ'লে তিনি অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনা পড়ুন। সেকালে এ দেশে লোকের আরামও ছিল না, বিলাসী হবার সুযোগও ছিল না। ভারতচন্দ্র বলেছেন 'ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ!' সে যুগে দেশের কোনোও লোকের হাতে ক্ষণেকের জন্য চাঁদ আসুক আর না আসুক, অনেকের ভাগ্যেই ক্ষণে হাতে দড়ী পড়ত। ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়ীতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন ত দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নই; এবং চল্লিশ টাকা মাস মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক, আমরা কেউ মাসিক পত্রের এডিটারি করতেও প্রস্তুত নই। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যারা কবিতা লিখত তারা সব দাঁতে হীরে ঘসত আর তাদের ঘরে রুইমাছ ও পালং শাক ভারে ভারে আসত।

(৭)

এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকড়া নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত ও রসনা কণ্টকিত হয়ে ওঠে এবং বিলাসীর মন ত একেবারে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক সাংসারিক জীবনের এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিভে গিয়েছিল, না আরও ফুটে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে যে পতিনিন্দা করিয়েছেন সেই নিন্দার ভিতরই আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাব। সেই নিন্দাবাদটি নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

'তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে॥
নানাশাস্ত্র জানে কত কাব্য-অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা সাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদর প্রভু॥

এই ব্যজনিন্দা হচ্ছে ভারতচন্দ্রের আত্মকথা। এ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিষের পরিচয় পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু প্রমোদর প্রভু। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় Shakespeare বলে গণ্য সেই Cerventes-এর জীবন বিষম দুঃখময় ছিল অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনি বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে তাই। এ হাসির মূলে কি আজে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥

(৮)

পূর্ব্বেই বলেছি, ভারতচন্দ্রের জীবনীর বিষয় বিশেষ কিছু জানা নাই। তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গল, মানসিংহ, সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রভৃতিতে তিনি যে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন—তাই অবলম্বন করে এবং লোকমুখে তাঁর সম্বন্ধে কিম্বদন্তী শুনে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যে জীবনচরিত লেখেন সেই জীবনচরিত থেকেই তাঁর পরবর্ত্তী লেখকেরা তাঁর জীবনের ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। সে ইতিহাসটি আপনাদের কাছে এই জন্য ধরে দিলুম যে, আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর কাব্যের দোষগুণ তাঁর অসাড় চরিত্রের ফুল বা ফল নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। তাঁর কাব্যের চরিত্র যাই হোক্, তাঁর নিজের চরিত্র ছিল অনন্য-সাধারণ দৃঢ়। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ঘোর দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁর কাব্যের গায়ে পড়ে নি। এ ব্যাপারটির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। কারণ তথাকথিত ইংরাজীশিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। বিশেষতঃ যারা অচেতচিত্ত তাদের মনে এই ধারণা একবারে বদ্ধমূল হয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ এ যুগে ইউরোপে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা শুধু নিজের সুখ দুঃখের গান গেয়েছেন কখনো হেসে কখনো কেঁদে। প্রথম পুরুষকে উত্তম পুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে তাঁদের কাব্যের মাল ও মসলা। কিন্তু এঁদেরও এই স্ব বস্তুটি যে ক্ষেত্রে অহং সে ক্ষেত্রে তাঁরা অকবি, আর যে ক্ষেত্রে তা আত্মা সে ক্ষেত্রে তাঁরা কবি। অহং ও আত্মা যে এক বস্তু নয়, সে কথা কি এ দেশে বুঝিয়ে বলা দরকার? ভারতচন্দ্র ছোট হন বড় হন জাৎ-কবি সুতরাং তাঁর অহং-এর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে, এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে "দূষিত," এ সব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। সুখের বিষয় সংস্কৃত কবিদের জীবন-চরিত আমাদের কাছে অবিদিত, নচেৎ সমালোচকদের হাতে তাঁরাও নিস্তার পেতেন না।

(৯)

আন্দাজ দশ বারো বৎসর আগে আমি দারজিলিং সহরে একটি সাহিত্য-সভায় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। পরে দেশে ফিরে সেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি।* বলা বাহুল্য প্রাক্ বৃটীশযুগের, ভাষান্তরে নবাবী

* ইংরাজী প্রবন্ধটি ১৩৩১ সালের কল্লোলের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।—কঃ সঃ

আমলের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের নাম উহ্য রাখা চলে না। তাই উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দর নামক কাব্যের দোষগুণ বিচার করতে আমি বাধ্য হই। সে প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের অতি-প্রশংসাও নেই অতি-নিন্দাও নেই। এর কারণ নিন্দা প্রশংসায় যাঁরা সিদ্ধ হস্ত তাঁদের ও বিষয়ে অতিক্রম করবার আমার প্রবৃত্তিও নেই শক্তিও নেই। কারও পক্ষে অথবা বিপক্ষে জোর ওকালতি করা আমার সাধ্যের অতীত। প্রমাণ—আমি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করেছি কিন্তু আদালতের পরীক্ষায় ফেল করেছি। ভারতচন্দ্র বলেছেন উকিলের

'সবে গুণ, যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে।'

সাহিত্যের আদালতে এ গুণের গুণগ্রাহীরা আমাকে নির্গুণ বলেই প্রচার করছেন।

সে যাই হোক, উক্ত প্রবন্ধ থেকেই সাধু সাহিত্যাচার্য্যেরা ধরে নিয়েছেন যে, আমি আর ভারতচন্দ্র দুজনে হচ্ছি পরস্পরের মাস্তুতো ভাই। আমি উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধটি আজ আবার পড়ে দেখলুম, তাতে এমন একটিও কথা নেই—যা আমি তুলে নিতে প্রস্তুত। সমালোচকদের স্থূল হস্তাবলেপের ভয়ে আমি আমার মতামতকে ডিগবাজি খাওয়াতে শিখি নি।

যা একবার ইংরাজীতে বলেছি বাঙালায় তার পুনরুক্তি করবার সার্থকতা নেই। শুধু তার একটি মত সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে দু'চার কথা বলতে চাই। সে কথাটি এই—

Bharatchandra, as a supreme literary craftsman will ever remain a master to us writers of the Bengalee language.'

(১০)

আমি এখন লেখক হিসেবেই, পাঠক হিসেবে নয়, ভারতচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে আরও দু'চারটি কথা বলতে চাই। আমি যে একজন লেখক সে কথা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেন না, যাঁরা আমার লেখা আদ্যোপান্ত পড়েছেন, এমন কি তার Microscopic examination করেছেন। ভাগ্যিস আমাদের চোখের জ্যোতি X-rays নয়, তা হলে আমার চার পাশে শুধু নরকঙ্কাল দেখতে পেতুম'। কিন্তু আপনারা যে আমাকে লেখক বলে গণ্য করেন তার প্রমাণ আপনারা আমাকে এ আসনে বসিয়েছেন, আমি বক্তা বলে না, লেখক বলে।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের আরম্ভেই একবার বলেছেন—

নূতন মঙ্গল আসে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

তারপর আবার বলেছেন—

কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

কথা যুগপৎ সরল করে ও সরস করে বলতে চায় শুধু সাহিত্যিকেরা; কারণ কোনও সাহিত্যিকই অ-সরল ও অ-সরস কথা ইচ্ছে করে বলে না, তবে কারও কারও স্বভাবের দোষে বিরস ও কুটিল কথা মুখ থেকে অনর্গল বেরয়।

আমি এ কথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, আমি সরল ও সরস ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি, তবে তাতে কৃতকার্য্য হয়েছি কি না তার বিচারক আমি নই,—সাহিত্যসমাজ।

ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর আসি আর পোনেরো বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ছাড়ি। এই দেশই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে। অর্থাৎ এ দেশে আমি যখন আসি তখন ছিলুম আধ আধ ভাষী বাঙাল, আর স্পষ্ট ভাষী বাঙালী হয়ে এ দেশ ত্যাগ করি। আমার লেখার ভিতর যদি সরলতা ও সরসতা থাকে ত সে দুটি গুণ এই নদীয়া জিলার প্রসাদে লাভ করেছি। ফলে বাঙলায় যদি এমন কোনও সাহিত্যিক থাকে যে 'কহিলে সরস কথা বিরস বাখানে' তাকে দূর থেকে নমস্কার করি মনে মনে এই কথা বলে যে, তোমার হাতযশ আর আমার কপাল।

(১১)

ভারতচন্দ্রের লেখার ভিতর কোন্ কোন্ গুণের আমরা সাক্ষাৎ লাভ করব তার সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে—

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্র যা পড়েছিলেন তা যে লিখতে পারতেন সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই—কারণ নিত্য দেখ্‌তে পাই হাজার হাজার লোক তা কর্‌তে পারে। এই বাঙলা দেশে প্রতি বৎসর স্কুল কলেজের ছেলেরা যখন পরীক্ষা দেয় তখন তারা 'যেই মত পড়িয়াছে সেইমত লেখা' ছাড়া আর কি করে? আর যে যত বেশী পড়া দিতে পারে সে তত বেশী মার্ক পায়। তবে সে সব লেখা যে 'বুঝিবারে ভারি' তা তিনিই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিদ্যার পরীক্ষক হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, ও জাতীয় লেখার ভিতর প্রসাদগুণও নেই, রসও নেই, আছে শুধু বই-পড়া মুখস্থ পাণ্ডিত্য। আশা করি বাঙালী জাতি, কস্মিনকালেও বিলেতি 'বিদ্যাভ্যাসাৎ' এতদূর জড়বুদ্ধি হয়ে উঠবে না যে, উক্ত জাতীয় লেখাকে সাহিত্য বলে মাথায় তুলে নৃত্য করবে। ভারতচন্দ্র কি পড়েছিলেন ও ছিলেন জানেন্?—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক,
অলঙ্কার সঙ্গীত গ্রন্থের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী,

যেই মত পড়েছিলেন, সেই মত তিনি লেখেন নি কেন তাই বুঝালে সাহিত্যের ধর্ম্ম যে কি, সকলের কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ যুগে আমরা কোন কবির জজ কিম্বা উকিলকে ক্রিটিক বলে গণ্য করি নে, সাহিত্য-সমাজের পাহারাওয়ালা-দের ত নয়ই। তাঁকেই আমরা যথার্থ সমালোচক বলে স্বীকার করি যিনি সাহিত্য-রসের যথার্থ রসিক। এ জাতীয় রস-গ্রাহীরা জানেন যে, সাহিত্যের রস এক নয়,—বহু এবং বিচিত্র। সুতরাং কোন্ লেখকের কাব্যে কোন্ বিশেষ রস বা বিশেষ গুণ ফুটে উঠেছে তাই যিনি ধরতে পারেন ও পাঁচ জনের কাছে ধরে দিতে পারেন, তিনি হচ্ছেন যথার্থ ক্রিটিক।

(১২)

এখন ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রসাদগুণ যে অপূর্ব্ব এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সে গুণ সম্বন্ধে কোন চক্ষুমান বাঙালীর পক্ষে অন্ধ হওয়া অসম্ভব। এখন এই সর্ব্ব আলঙ্কারিক পূজিত গুণটি কি?—যে লেখা সর্ব্বসাধারণের কাছে সহজ-বোধ্য সেই লেখাই কি প্রসাদগুণে গুণান্বিত? তা যদি হত তা হলে কালিদাসের কবিতার চাইতে মল্লীনাথের টীকার প্রসাদগুণ ঢের বেশী হত। তা যে নয় তা সকলেই জানে। প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ। ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গ সরস্বতী একেবারে 'তন্বী-শ্যামা শিখরদশনা' রূপ ধারণ করেছে। যাঁর অন্তরে বঙ্গভাষা এই প্রাণবন্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ লাভ করেছে, তাঁর যে কবিপ্রতিভা ছিল সে বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষাকে শাপমুক্ত করা যদি তাঁর একমাত্র কীর্ত্তি হত তাহলেও আমরা বাঙালী লেখকেরা তাঁকে আমাদের গুরু বলে স্বীকার করতে তিল মাত্র দ্বিধা করতুম না। অমন সরল ও তরল ভাষা তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি নে। আর আমি অপর কোন সাহিত্য জানি আর না জানি, বাঙলা সাহিত্য অল্প বিস্তর জানি।

আমি পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার মহাগুণ কীর্ত্তন করি, কিন্তু সে ভুল করে। সেকালে আমার চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এখন দেখ্‌ছি উক্ত পদাবলীর ভাষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা নয়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখে মুখে রূপান্তরিত হয়েই চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা যে তার বর্ত্তমান রূপ লাভ করেছে সে বিষয় আমি এখন নিঃসন্দেহ। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের হিষ্টরি লেখা হয়েছে, কিন্তু এখনও সে সাহিত্যের জিওগ্রাফি লেখা হয় নি। যখন সে জিওগ্রাফি রচিত হবে তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে,

ভারতচন্দ্রের এ উক্তি সত্য যে নবদ্বীপ সেকালে ছিল ভারতীয় রাজধানী—ক্ষিতির প্রদীপ।

আমি বলেছি যে প্রসাদগুণ ভাষার গুণ কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে ভাষা ছাড়া ভাব নেই। নীরব কবিদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। যা আমরা ভাষার গুণ বলি তা হচ্ছে মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং আসলে প্রসাদগুণ হচ্ছে মনেরই গুণ, ও বস্তু হচ্ছে মনের আলোক।

(১৩)

ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে তাঁর কাব্যে প্রসাদ পূর্ণ থাকবে ও তা হবে রসাল। এ দুই বিষয়ই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল ত এইখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের অন্যতম রস সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরিক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক বিজ্ঞানে।

সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা, অলঙ্কার ও সাধু ভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এ স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহাসাধু কবি বলে গণ্য। গান-রচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি কিন্তু বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই? চণ্ডীদাস মহাকবি কিন্তু তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্ত্তন কি বিদ্যাসুন্দর চাইতে সুরুচিসম্পন্ন? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র কিনা যে, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনাবৃত। আমি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ কলঙ্কমোচন করতে চাই নে, কেন না তা করা অসম্ভব। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারও তত নয়। আর এর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের শুধু nature. ভারতচন্দ্র যা দিয়ে তা ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন তাতেই তা ফুটে উঠেছে। তাঁর ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রসাদেই তাঁর কথা কারও চোখ কান এড়িয়ে যায় না। পাঠকের পক্ষে ও-জিনিষ উপেক্ষা করবার পথ তিনি রাখেন নি। তবে এক শ্রেণীর পাঠক আছে যাদের ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা ততটা চোখে পড়ে না যতটা পড়ে তাঁর art. তার পর ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।

(১৪)

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়,—মস্তিষ্ক, জীবন নয়,—মন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এ রসের নাম আছে কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান নেই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকদের রসালাপ শুনে আমাদেরও হাসি পায় কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্য রসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।

বাঙলার প্রাচীন কবিরা কেহই এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধুব্যক্তির কাছে অপ্রিয়। হাস্য রস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে তার পরিচয় আরিষ্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্য্যন্ত সকল হাস্য-রসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিষটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়,—মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট সে কথা ত সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁর হাসিও নাকি জঘন্য। সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যে সব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক মহাশয় বলেছেন যে, "শ্বশুরের সঙ্গে এহেন ইয়ারকি কোন্ সমাজের

সুরীতি ?” আমিও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সমালোচনা কোন্ সাহিত্য-সমাজের সুরীতি, এর নাম ছেলেমি না জেঠামি ? তাঁর নারীগণের প্রতি নিন্দাও দেখতে পাই অনেকের কাছে নিতান্ত অসহ, সে নিন্দার অশ্লীলতা বাদ দিয়ে তার বিদ্রূপই নাকি পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগে। নারীর মুখে পতি নিন্দার সাক্ষাৎ ত ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য কবির কাব্যেও পাই, এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির মুখে পতিনিন্দা, এঃ ধর্ম্ম সনাতন। এস্থলে পুরুষজাতির কিংকর্ত্তব্য ? হাসা, না কাঁদা ? বোধ হয় কাঁদা, নচেৎ ভারতের হাসিতে আপত্তি কি ? আমি উক্ত জাতীয় দেবতাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, দেবতার চোখের পলকও পড়ে না জলও পড়ে না। আমাদের দেবদেবীর পুরাণ কল্পিত ইতিহাস অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন। এও নাকি তাঁর একটি মহা-অপরাধ। এ যুগের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে, সে পরিহাস তাঁদের অসহ ? ভারত-সমালোচনার যে ক'টি নমুনা দিলুম তাই থেকেই দেখতে পাবেন যে, অনেক সমালোচক কোন রসে একেবারে বঞ্চিত। আশা করি, যে হাস্‌তে জানে না সে-ই যে সাধু পুরুষ ও যে হাসতে পারে সে-ই যে ইতর, এহেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।

আমি আর একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেই এ যাত্রা ক্ষান্ত হব। এ দেশে ইংরাজদের শুভাগমনের পূর্ব্বে বাঙলাদেশ বলে যে একটা দেশ ছিল আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, কেননা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষা-গুরুদের মতে বাঙালী জাতির জন্ম-তারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বশেষে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা ভারতচন্দ্রের কথাতেই করি। আপনারা আমাকে এ সভায় কথা কইতে আদেশ করেছেন—

সেই আজ্ঞা অনুসরি কথাশেষে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখে দুষ্ট মত
সারি দিবা এই নিবেদন॥

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ, প্রথমভাগ—স্বামী রামানন্দ প্রণীত। নূরনগর, খুলনা, রামকৃষ্ণমঠ ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে স্বামী কৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম দশ আনা।

সৃষ্টি-তত্ত্ব, ঈশ্বর-নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সরল সুন্দর উপদেশগুলি গ্রন্থকার যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেইভাবে সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

সত্যের সন্ধান—শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; ঢাকা, ইষ্ট-বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বইখানি বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত এগারটি প্রবন্ধ ও আলোচনা-সমষ্টি। গ্রন্থকারের জীবনে যে সকল সমস্যা ও প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, সেইগুলিকে তিনি দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়া বিচার ও আলোচনা করিয়াছেন।

বইখানিতে স্বাধীন চিন্তাশীলতায় পরিচয় পাওয়া যায়।

ইস্‌লাম ও ইহার শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ—মোহাম্মদ তৈমুর প্রণীত। হজরত মোহাম্মদের জীবনী ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা। এই অজ্ঞতা ও ধর্ম্মান্ধতার দিনে এই সকল জীবনী ও ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা প্রশংসনীয়।

আমরা গ্রন্থখানির প্রচার কামনা করি।

স্বামীর পত্র—প্রথমভাগ ;—অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম-এ লিখিত। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম একটাকা।

পত্র লেখার ছলে স্ত্রীকে নানাবিষয়ের উপদেশ-প্রদানই গ্রন্থখানির মুখ্য উদ্দেশ্য। স্ত্রী-শিক্ষা, শিক্ষনীয় বিষয়, নারীদের স্বাস্থ্যরক্ষা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি কয়েকটি স্তবকে গ্রন্থখানি সজ্জিত।

ছাপা-বাঁধাই ভালো। তবে, গ্রন্থের ভাষা আরও সরল ও সহজ হইলে ভালো হইত বলিয়া মনে হয়।

হে

চরকা-বুড়ী—শিশুসাহিত্যে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ-গুপ্ত মহাশয়ের অন্যতম দান। ইহা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত আটটি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহার মধ্যে কয়েকটি গল্প বড়ই রসাল এবং উপভোগ্য হইয়াছে।

তবে শিশুসাহিত্যে বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষার প্রয়োগ যথাসম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ নিয়মের ব্যাতিক্রম এই পুস্তকের একাধিক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। গদ্যে, পদ্যে এবং নানা চিত্রে সুচিত্রিত হইয়া ইহা শিশুদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করিতে পারিবে আশা করা যায়।

দি বুক কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত—দাম আটআনা মাত্র।

উলট্‌ পালট্‌—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত লিখিত চৌদ্দটি সাময়িক এবং সামাজিক নক্সার ছবি। পুস্তকটির ভাব এবং ভাষা যেমন সহজ, প্রকাশ-ভঙ্গীও তেমনই সরল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বহু ইংরেজী কথা, এমন কি অনেক স্থানে ইংরেজীতে বড় বড় যৌগিক বাক্য এবং তাহার বাংলা তর্জ্জমার একত্র সমাবেশে ইহার সৌষ্ঠবের হানি হইয়াছে।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—মূল্য ১।০ মাত্র।

রূপতৃষ্ণা—উপন্যাস। লেখক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। মূল্য—একটাকা মাত্র। 'পরিচয়'এ প্রকাশ—উপন্যাস ব্রতে মিত্র মহাশয় নূতন ব্রতী। সুতরাং তাঁহার নবীন উদ্যমে যদি কোনও

ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলে পাঠকবর্গের নিকট এই উপন্যাসখানি অন্যান্য অনেক উপন্যাসের মতই উপভোগ্য হইবে।

আরতি—কবিতার সমষ্টি, মূল্য একটাকা। প্রাপ্তিস্থান—লেখকের নিকট, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এম, এ। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিবেদনে লিখিয়াছেন, কবিতাগুলি তাঁহার কৈশোর রচনা। সঙ্কোচে লিখিয়াছেন, এ-গুলি প্রকাশের যোগ্য নহে জানিয়াও তবু এ-গুলি মায়ার বশে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কবিতাগুলি পড়িয়া বিশেষ আনন্দই লাভ করিলাম। ধীরেন্দ্রনাথ এখন বাঙলায় এম, এ পাশ করিয়াছেন, এবং বয়সেও আর কিশোর নহেন, তাই বোধ হয় নিজ রচনা সম্বন্ধে এখন তাঁহার এত সঙ্কোচ। পণ্ডিত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কবির পুস্তকে আশীর্ব্বাণীতে লিখিয়াছেন, '… পড়িয়া মনে হইল, শ্যামা বঙ্গজননীর কাব্য-কাননে আর একটি নবীন পিক সাড়া দিতেছে। … ভাবের মাধুর্য্যে ও ভাষার সৌন্দর্য্যে তাঁহার 'আরতি' বঙ্গীয় পাঠকের উপেক্ষনীয় নহে। … আরতি খণ্ডকাব্য, কিন্তু কবিতাগুলির মধ্যে একটা আন্তরিক যোগ আছে।'

পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথের এই কথাগুলিই বোধ হয় বঙ্গীয় পাঠক-বর্গের এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার প্রলোভনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

ফুল্লরা—লেখক শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী বি, এ; প্রকাশক বুক ষ্টল, পি—৮১ রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

বিভাসচন্দ্র 'ফুল্লরা'র প্রাচীন কাহিনীটি শিশুপাঠ্যরূপে সুন্দর ও সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিভাসবাবুর লেখায় শিশুমন হরণ করিবার বেশ একটু হাতযশ আছে। তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত 'অভিশাপ' নামক গল্পের বইখানিও শিশু-রাজ্যে খুব সমাদর পাইয়াছে। এখানিও যে সেরূপ আদর পাইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বাংলার বাণী— নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র। ৫২নং জনশন রোড, ঢাকা। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক আনা মাত্র।

মফঃস্বল হইতে পরিচালিত 'বাংলার বাণীর কয় সংখ্যা পড়িয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইলাম। নলিনীকিশোর বাবু সুলেখক, সম্পাদক-এর যোগ্যতাও তাঁহার যথেষ্টই আছে এবং তাহারই পরিচয় এই 'বাংলার বাণী'তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যুক্তিতর্ক, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, ছাপা ইত্যাদি সবই সুন্দর। এই পত্রিকাখানা পূর্ব্ববঙ্গের কেন, বাংলার একটা বিশিষ্ট অভাব দূর করিবে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। উদ্যোক্তাগণের প্রচেষ্টা সফল হোক, সার্থক হোক, এই কামনা।

নিম্নলিখিত নব-প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত—নারীর কেশ—	১৷০
শ্রীনিবারণচন্দ্র পাল প্রণীত—ভারতকাহিনীগাথা (১ম খণ্ড)	৷৵০
শ্রীতারানাথ রায় লিখিত—রাগরেখা—	২৲
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত—মানুষ গড়া—	১৷০
শ্রীঅমূল্যকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত—আগুনের ফুল—	১৷০
কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত—ব্যথার দান (৩য় সংস্করণ	১৷০
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—স্বাধীন মানুষ—	১৷০
শ্রীবিপিনবিহারী মণ্ডল—স্বাস্থ্য-সখা (১ম ও ২য় ভাগ —	১৲
শ্রীবিপিনবিহারী মণ্ডল—বাঙ্গালা গীতা ও অনুগীতা—	১৲
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—মাতৃস্নেহ—	৵০
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত—বিনোদিনী—	১৲
নাসির উদদীন সম্পাদিত—বার্ষিক সওগাত—	১৸০
সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা—মাসিক পত্রিকা ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা—বার্ষিক	৩৸০
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—বানভাসি—	১৷০
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত—বেদে—	১৷
শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত—(নাটক) দেবাসুর—	১৲

গোকুলচন্দ্র নাগ

গোকুলচন্দ্র নাগ-স্মৃতি-পুরস্কার

স্বর্গগত গোকুলচন্দ্র নাগ 'কল্লোল' মাসিক পত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ; সাহিত্য, চিত্র-শিল্প ও সঙ্গীতের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। গত ৮ই আশ্বিন, ১৩৩২ সাল, গোকুলচন্দ্র অতি অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন।

এই শিল্পানুরাগীর স্মৃতি-রক্ষার্থে প্রতি বৎসর একটি একশত টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর (১৩৩৫ সাল) কল্লোলে প্রকাশিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের জন্য এই পুরস্কারটি প্রদত্ত হইবে। দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবন্ধগুলি বিচার করিয়া যে প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত করিবেন, উক্ত প্রবন্ধের লেখককেই এই অর্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচকের বিচারে কোন প্রবন্ধই উক্ত পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত না হইলে সে বৎসর পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

সর্ব্ব সাধারণের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই স্মৃতি-পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। গোকুলচন্দ্রের বন্ধু, আত্মীয় বা কোনও সাহিত্যানুরাগী যদি এই স্মৃতি-পুরস্কারের তহবিলে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই স্মৃতি-রক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ঢাক্‌নাহাওয়া, পোঃ অঃ দেও, জিলা গয়া (Camp Dhaknahawa, P. o. Deo, Dist. Gaya) এই ঠিকানায় অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। প্রবন্ধ বিষয়ানুযায়ী যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় লিখিত হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়।

এই পুরস্কারটি প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য প্রদত্ত হইবে। কোন্ বৎসর কি বিষয়ের জন্য দেওয়া হইবে তাহা প্রতি বৎসর কল্লোলের বৈশাখ সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হইবে। ইতি—

—বিনীত নিবেদক

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ, শ্রীমতী সুনীতি দেবী, শ্রীমতী নিরুপমা দাশগুপ্তা, শ্রীমতী উমা গুপ্তা, শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু, শ্রীমতী বিভা মিত্র, শ্রীমতী অতসী দেবী, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীজগৎবন্ধু মিত্র, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅজিতকুমার সেন, শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্তা, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়, শ্রীমুরলীধর বসু, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত, শ্রীনীতিকুমার পাকড়াশী, শ্রীমনীশ ঘটক, শ্রীসতীপ্রসাদ সেন, শ্রীঅনন্তকুমার ঘোষ, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ, কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীযামিনীরঞ্জন রায়, শ্রীশশিপতি চৌধুরী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা সরকার, শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীসোমনাথ সাহা, শ্রীভূপতি চৌধুরী, শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীমতী মায়া দেবী, শ্রীহরিহর চন্দ্র, শ্রীমতী অশ্রুকণা চন্দ্র, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীমতী ক্ষীরোদসুন্দরী দাশগুপ্তা, শ্রীমতী অণুকণা দাশগুপ্তা, শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, শ্রীমতী ইলা হোম, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীপ্রভাতকুমার দে, জসীম উদ্‌দীন, শ্রীবিজলীবিহারী সরকার, শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীবিনয়কুমার দাশগুপ্ত, শ্রীসুহৃৎকুমার সিংহ, শ্রীরথীরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীমতী বাসন্তী মজুমদার, শ্রীনীরেন্দ্র রায় চৌধুরী।

Published by Sj Dineshranjan Das from 10-2 Patuatola Lane, and Printed by the same at the Rahasya Lahari Press, 2A Akrur Dutt Lane, Calcutta.

KALLOL

Reg. No. C. 1157